ইরান দুহিতা
ফরাজী জুলফিকার হায়দার

ইরান দুহিতা

ফরাজী জুলফিকার হায়দার

মদীনা পাবলিকেশান্স, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শাখা ঃ ৫৫বি. পুরানা পল্টন (২য় তলা). ঢাকা-১০০০

ইরান দুহিতা

ফরাজী জুলফিকার হায়দার

প্রকাশক
মদীনা পাবলিকেশন্স-এর পক্ষে
মোর্তজা বশীরউদ্দীন খান
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৪৫৫৫

প্রথম প্রকাশ :
জমাদিউল আউয়াল ১৪১৬ হিজরী
আশ্বিন ১৪০২ বাংলা
অক্টোবর ১৯৯৫ ইংরেজী

তৃতীয় সংস্করণ :
রবিউল আউয়াল ১৪২৩ হিজরী
জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ বাংলা
জুন ২০০২ ইংরেজী

চতুর্থ সংস্করণ :
মে ২০০৪ ইংরেজী

প্রচ্ছদ :
মোঃ জামাল

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৭৫· ০০ টাকা মাত্র

ISBN : 984-8367-59-6

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আলহামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন আছছালাতু ওয়াছ ছালামু আলা রাসূলিহীল কারীম।

আম্মাবাদ।

সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ইরান দুহিতার প্রকাশনা হতে আরম্ভ করে বর্তমান পুস্তকাকারে বের করার সবটুকু কৃতিত্বই মূলতঃ আমাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন, ইসলামী চিন্তাবিদ, মুজাহিদে দ্বীন ও ফখরুল উলামা মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবেরই প্রাপ্য। এর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে খাট না করে কৃতজ্ঞ আমি খাকছার আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি ঃ

আল্লাহুম্মা রাব্বানা, ওয়াফফেক লাহু ছেহ্হাতা ওয়াল আফিয়াতা; ওয়া ছাব্বেত কাদামুহু ফিল্ খেদমাতিল ইসলামে ওয়াল মুসলেমীন। আমীন!

“ইরান দুহিতা” পুস্তকাকারে বের করার ব্যাপারে তাঁরই যোগ্যতম পুত্র মুসলিম জাহানের সম্পাদক জনাব মোস্তফা মঈনউদ্দীন খান নিরলসভাবে যে পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তার জন্য

আহলান ওয়া ছাহলান ওয়া মারহাবান লাহু।

পাঠকবর্গকে আমার সালাম। আছছালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

ফরাজী জুলফিকার হায়দার
সোনার বাংলা মহাবিদ্যালয়
বাটাজোর, ভালুকা
ময়মনসিংহ।

আমাদের কয়েকটি মননশীল প্রকাশনা

উপন্যাস

বখতিয়ারের তলোয়ার
–শফীউদ্দীন সরদার

যায় বেলা অবেলায়
–শফীউদ্দীন সরদার (যন্ত্রস্থ)

সুলতানা বিলকিস
–জহীর বিন কুদ্দুস (যন্ত্রস্থ)

রম্য সাহিত্য

প্রেস্টিজ কনসার্ণড –১
–জহুরী

প্রেস্টিজ কনসার্ণড –২
–জহুরী

জহুরীর জাম্বিল –১
–জহুরী

জহুরীর জাম্বিল –২
–জহুরী

নষ্ট দর্শন
–আবদুল মবিন

ইতিহাস

আযাদী আন্দোলন–১৮৫৭
–মুহিউদ্দীন খান

ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত
–আশকার ইবনে শাইখ

কাব্য

কাসিদায়ে বোরদা
অনুবাদঃ রুহুল আমীন খান (যন্ত্রস্থ)

এখানে রাত্রি নামে
– মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

প্রসঙ্গ কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

লেখক ফরাজী জুলফিকার হায়দার একজন উদীয়মান সাহিত্য সেবী। ধার্মিক পিতামাতার গৃহে তাঁর জন্ম এবং অত্যন্ত ধার্মিক, শিক্ষিত ও ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিবান পরিবেশে লালিত-পালিত। মাদ্রাসা শিক্ষা লাভ করার পর তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অনার্সসহ এম. এ. ডিগ্রী গ্রহণ করেন।

অধ্যাপনার সাথে সাথে নীরব-নিভৃতে নিষ্ঠার সাথে সাহিত্য চর্চাই তাঁর ব্রত। ইসলামী চেতনাবোধকে সমুন্নত ও শান্‌দার করাই তাঁর জীবনের লক্ষ্য।

যাকে সত্য গ্রহণ করার তৌফিক আল্লাহ তায়ালা দান করেন, তিনি রাজকীয় ঐশ্বর্য, পারিবারিক সম্ভোগ ও সামাজিক কুল-মান-যশ হাসিমুখে বর্জন করে মহা সত্যের ঐশী প্রেরণায় যেকোন কষ্ট ও যন্ত্রণাকে সহাস্যে বরণ করে নিতে মোটেই দ্বিধা করেন না; তাই প্রমাণ করেছেন শাহের বানু, তদীয় ভগ্নীদ্বয় গুলবানু ও পরীবানু এবং শেরদীল শমসের ও অন্যান্য চরিত্রগুলো।

তাঁর রচিত 'ইরান-দুহিতা' উপন্যাসটি শুধু মুসলমানদের চেতনাবোধকে সঞ্জীবিত করা নয়, উপরন্তু ইসলামের শাশ্বত সত্যকে লাভ করার জন্য যারা আগ্রহী, তৌহিদের চেতনা ও সত্য গ্রহণের অপার ঐশী প্রেরণা অমুসলমান ভাইয়েরাও এ পুস্তক পাঠে লাভ করুন— মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে কায়মনো বাক্যে এই প্রার্থনা করছি।

হে আল্লাহ! তোমার সৃষ্ট দুনিয়ার এখনো তিন চতুর্থাংশের বাসিন্দা তোমার দ্বীনের জ্যোতি হতে বঞ্চিত। তাদেরকে তৌহিদ গ্রহণের ও তোমার জ্যোতি দর্শনের এবং যাঁর জন্য দুনিয়া সৃষ্টি করেছ— সেই মহামানব (সাঃ)-এর অমৃত প্রেম সুধা আকণ্ঠ পান করে ঐহিক ও পারত্রিক জীবনের শাশ্বত কল্যাণের উত্তরাধিকার করো।

এক সময়ে 'বিষাদ সিন্ধু' মুসলিম বাংলায় যে উদ্দীপনা ও ধর্মীয় চেতনার দ্বার উন্মুক্ত করেছিল; হে আল্লাহ! (তোমার ইচ্ছায় তো মূষিকও ভূধরকে টলাতে

পারে) তেমনি এই পুস্তকের দ্বারা অচেতন ও অর্ধচেতন মুসলিম সমাজে নতুন উদ্দীপনার জোয়ার সৃষ্টি করো। আল্লাহ্ ও রসূলের বাণীকে যাঁরা নিঃস্বার্থভাবে শুধু ঐশী পুরস্কারের আশায় কষ্ট স্বীকার করে অত্র পুস্তকটির প্রকাশনাকার্যে অর্থ, শ্রম ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন, হে আল্লাহ্, তুমি তাঁদের সকলকে বিশেষ করে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ সর্বজন শ্রদ্ধাভাজন মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবকে জাযায়ে খায়ের দান করো। আমীন!

তারিখ,
বাটাজোর
১১-৭-৯৪

আজহার আলী খান
অধ্যক্ষ, সোনার বাংলা মহাবিদ্যালয়
বাটাজোর, ভালুকা,
ময়মনসিংহ।

ইরান দুহিতা

পূর্ব কথা ১

ইরান দুহিতা বা শাহেরবানু ছিলেন সৈয়দকুল শিরোমণি শহীদে কারবালা হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর সহধর্মিণী এবং হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রঃ) [আলী আছগর]-এর গর্ভধারিণী জননী।

আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলে গেছেন, "আমার কন্যা ফাতেমা হতেই আমার বংশ বিস্তার করবে।"এ হাদীস অনুযায়ী নবী নন্দিনী হযরত ফাতেমা (রাঃ) হতেই অদ্যাবধি পৃথিবীতে সৈয়দ-কুল সিলসিলা জারি হয়ে আসছে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে।

সৈয়দকুলের সিলসিলা আমরা এভাবে দেখতে পাইঃ ১. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ), ২. তাঁর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ), ৩. তাঁর পুত্র হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ), ৪. তাঁর ছেলে হযরত জয়নুল আবেদীন (রঃ)। এ জয়নুল আবেদীনের আটজন পুত্র ছিলেন বলে ইতিহাসে পাওয় যায়। এ আট সাহেবজাদা হতেই সৈয়দকুল জারি রয়েছে।

নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সৈয়দী রক্তের সাথে যে কোন সাধারণ বংশের রক্তের সংমিশ্রণ ঘটতে পারে না। পরম করুণাময় আল্লাহর কুদরত বোঝার ক্ষমতা মানুষের নেই। তাই দেখা যায় পরবর্তী সময়ে মহানের ইচ্ছায় এ মহান বংশের শোণিতের সাথে সংমিশ্রণ ঘটেছিল তদানীন্তন বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজশক্তি পারস্যের কেছরা রাজবংশের আর্য রক্তের। যে রাজবংশ দীর্ঘ আড়াই হাজার বৎসর যাবৎ প্রবল প্রতাপের সংগে ন্যায়বিচারের মাধ্যমে পরিচালনা করে আসছিল শাসনকার্য। বিশ্ববিখ্যাত ন্যায়বিচারক নওশেরওঁয়া ছিলেন এ বংশেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতি।

সৈয়দকুল শিরোমণি শহীদে কারবালা হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর অন্যতম পত্নী এবং হযরত জয়নুল আবেদীনের গর্ভধারিণী মাতা শাহেরবানু ছিলেন এ ঐতিহ্যবাহী কেছরা বংশেরই দুলালী। সর্বশেষ কেছরা সম্রাট তৃতীয় ইয়াজদিগার্দের দুহিতা।

এ ইরান দুহিতা শাহেরবানু কিভাবে ঈমানের সন্ধান পেয়েছিলেন তা একটি বিরাট জিজ্ঞাসা। এ জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে গিয়েই সৃষ্টি হয়েছে ইরান দুহিতার।

পূর্ব কথা ২

আমাদের মহানবী (সাঃ) আধ্যাত্মিকভাবে নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিলেন যে, ঐতিহ্যবাহী পারস্য রাজবংশের সাথে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে। তাই কয়েকবারই তাঁর পবিত্র জবান হতে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যদ্বাণীরূপে উচ্চারিত হয়েছে পারস্য রাজপ্রাসাদের অনেক কথা।

হিজরতের সময় যে সোরাকা মহানবীর পথ রোধ করার চেষ্টা করেছিলেন সে সোরাকাকে মহানবী বলেছিলেন, " কেছরা বাদশার কংকন তুমি হাতে পরে নিও।" মহানবীর এ ভবিষ্যদ্বাণী একদিন অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছিল। মক্কা বিজয়ের সময় সোরাকা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হযরত ওমর (রাঃ)-র খেলাফতের সময় পারস্যের রাজধানী মাদায়েন পতনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যের মধ্যে সম্রাট তৃতীয় ইয়াজদিগার্দের হাতের কংকনও ছিল এবং তা সোরাকার ভাগেই পড়ে। সোরাকা মহানন্দে তা নিজের হাতে পরে মহানবীর অমর ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবরূপ দান করেন। অচিরেই মুসলমানদের হাতে পারস্যের পতন ঘটবে এবং 'কেছরাদের রাজপ্রাসাদ অধিকার করবে" মহানবীর এ ভবিষ্যদ্বাণীতে তারই ইংগিত ছিল।

পরিখা যুদ্ধের পরিখা খননের সময় একটি বড় পাথর সরাতে বা ভাংতে না পেরে সাহাবীগণ তা মহানবীকে জানালেন। তিনি নিজে গিয়ে কোদালের ঘাড়া দিয়ে পাথরটায় পর পর তিনটি আঘাত করলেন। পাথরটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল । প্রতিটি আঘাতেই পাথরটি থেকে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছিল,আর প্রতিবারেই তিনি বলছিলেন, "এ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের আলোতে আমি পারস্যের কেছরা বাদশার রাজপ্রাসাদ দেখতে পাচ্ছি। "

মহানবীর এ ভবিষ্যদ্বাণীর ইংগিত ছিল যে, মুসলমানগণ অচিরেই কেছরার রাজপ্রাসাদ অধিকার করবে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর সময় এ বিজয় অর্জিত হয়।

মহানবীর এ সব ভবিষ্যত বাণীর পেছনে যেসব ইংগিত লুকানো ছিল, তার অর্থ তখন বোঝা না গেলেও পরবর্তী সময়ে ইংগিত যখন মূর্ত হয়ে উঠল, তখন তা সকলের কাছেই পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল।

ইতিহাস এখানে থেমে গেলেও ঘটনা চলছিল এগিয়েই আপন গতিতে কালের অন্তরালে সকলের অগোচরে অন্তঃসলিলা নদীর মত। সে ঘটনাকে সাজিয়ে উপস্থাপন করেছি মাত্র।

১

৬২৮ খৃস্টাব্দের কথা। হোদাইবিয়ার সন্ধির পর মহানবী (সাঃ) আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের শাসনকর্তাদের নিকট ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইয়া নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইতে লাগিলেন।

প্রবল প্রতাপশালী পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের নামেও বিখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ্ ইবনে হোজাইফা (রাঃ) মারফত মহানবী একটি ইসলাম গ্রহণের নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইলেন। পত্রটি নিম্নরূপে লিখিত হইয়াছিল ঃ

"বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম"

আল্লাহর রাছুল মুহাম্মদের পক্ষ হইতে

পারস্যপ্রধান খস্রুর সমীপে। তাহার উপর শান্তি বর্ষিত হউক যে হেদায়েতের অনুসারী হয়, আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তাঁহাকে এক বলিয়া সাক্ষ্য দেয়, তাঁহার কোন শরীক বা সমকক্ষ নাই এবং মুহাম্মদ তাঁহার বান্দাহ ও রাছুল।

হে রাজন!

আল্লাহর আদেশে আমি আপনাকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাইতেছি। কারণ সমস্ত মানব জাতির জন্য আমি তাঁহার রাছুল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি, যেন আমি সমস্ত জীবিত মানুষকে সতর্ক করি এবং অবিশ্বাসীদের কাছে তাহার বাণী পৌছাইয়া দেই। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন এবং সমস্ত বিপদ হইতে নিজেকে রক্ষা করুন।

আপনি যদি এই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেন তবে আপনার সমস্ত প্রজার ইসলামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানজনিত পাপ আপনার উপর বর্তাইবে। (১)

সীল মোহর

আল্লাহ্ রাছুল মুহাম্মদ

মহানবীর পত্র পাঠ করিয়া সম্রাট ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন, তাঁহার আপাদ-মস্তক কাঁপিতে লাগিল। কী! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! আমারই একটি সামান্য প্রজা আমার নামের পূর্বে তাহার নিজের নাম লিখিয়াছে? তদুপরি সে আমাকে আমার স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া তাহার ধর্ম গ্রহণ করিতে লিখিয়াছে? (১) (জুরকানী খামিছ)

স্পর্ধা তো কম নয়! খসরু পবিত্র পত্রখানা হাতে দলা পাকাইতে লাগিলেন। সভাসদগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন. আপনারা বলুন. এ বেয়াদবীর কি শাস্তি হতে পারে?

কেহ বলিল. তাকে হত্যা করা হোক জাঁহাপনা! কেহ বলিল. লোকটাকে দরবারে ডেকে এনে শূলে চড়ানো হোক. আলমপনা!

ক্রোধান্বিত সম্রাট যুবরাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমি কি বল শেরওয়াঁ!

শেরওয়াঁ বলিলেন. আমার মনে হয় পিতা হঠাৎ কিছু করে বসা হঠকারিতাই হবে। কারণ যতটুকু শোনা যায় তথাকথিত নবী দাবিদার লোকটির ক্ষমতা কিছু কম নয়। কয়েকটি যুদ্ধেই তিনি মক্কাবাসীদের পরাভূত করেছেন। ইদানীং মক্কাবাসীরা হোদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে তাঁর সাথে আপোষ করেছেন। কাজেই ভালভাবে ভেবে চিন্তে আমাদের এগুনো উচিত।

যুবরাজ শেরওয়াঁর কথা শুনিয়া খসরু আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন. সে একটি মরুর মেষ-রাখাল। তার নামের সাথে আবার সম্ভ্রম রক্ষা করে কথা বলছ। ছিঃ! ছিঃ!! তা ছাড়া তোমার কথা যদি সত্য হয় তবে তো তাকে আর বাড়তে দেয়া যায় না। অংকুরেই তাকে ধ্বংস করে দিতে হয়। নইলে সে আমার বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধারণ করতে পারে। কাজেই তোমার প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য. যুবরাজ! আমি এখুনি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি।

এই বলিয়া খসরু মহানবীর পত্রখানি টুকরা টুকরা করিয়া ধূলায় নিক্ষেপ করিলেন। মহানবীর দূত আব্দুল্লাহ্ ইবনে হোজাইফাকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। খসরুর তখন ধৈর্যের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার অধিনস্থ ইয়ামেনের শাসনকর্তা বাজানের নিকট এই বলিয়া পরওয়ানাসহ কয়েকজন দূত প্রেরণ করিলেন যে, মুহাম্মদকে (সাঃ) গ্রেফতার করতঃ অবিলম্বে আমার দরবারে প্রেরণ কর।

এইদিকে আব্দুল্লাহ ইবনে হোজাইফা (রাঃ) মদীনায় ফিরিয়া যাইয়া খসরুর দরবারে সমস্ত ঘটনা মহানবীর কাছে খুলিয়া বলিলেন। সব কিছু শুনিয়া তিনি বলিলেন, খসরু যেমন আমার পত্রটি টুকরো টুকরো করে ফেলেছে, তেমনি তার রাজ্যও অচিরেই মুসলমানদের হাতে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

খসরুর দূত যথাসময়ে ইয়ামেন পৌঁছিলে বাজান কাল বিলম্ব না করিয়া খসরুর দূতদের সঙ্গে বেশ কিছু সংখ্যক সৈন্য-সামন্ত দিয়া গ্রেফতারী পরওয়ানাটি মদীনায় পাঠাইয়া দিলেন। দূতগণ মদীনায় পৌঁছিয়া মহানবীর খেদমতে উপস্থিত হইল এবং খসরুর পরওয়ানা দেখাইয়া সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল। তাহারা আরও বলিল, যদি আদেশমত স্বেচ্ছায় আমাদের সঙ্গে শাহানশাহের দরবারে হাজির হও, তবে আমাদের ইয়ামেনের শাসনকর্তা তোমার জন্য সম্রাটের কাছে

সুপারিশ করতে পারেন। অন্যথায় শাহানশানের ক্রোধানলে পড়ে তুমি সদলবলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

মহানবী ইহাদের দুর্ব্যবহারে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বরং হাসিমুখেই যথাযোগ্যভাবে তাহাদের অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাহাদের পানাহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আগামীকল্য পুনরায় সাক্ষাৎ করিবার কথা বলিয়া দিলেন। পরদিন যথাসময়ে দূতগণ মহানবীর খেদমতে হাজির হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কার পরওয়ানা? কার হুকুম?

দূতদের একজন বিরক্তি সহকারে বলিল, তাতো গতকালই বলেছি, পারস্যের শাহানশাহ মহামান্য খসরু পারভেজের পরওয়ানা। আর ভনিতা নয় এবার চল আমাদের সাথে।

মহানবী মুচকি হাসিয়া বলিলেন, খসরু তো নিহত। গত রাত্রে খসরুর পুত্র শেরওয়াঁ তাকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেছে। তোমরা যাও, বাজানকে এ খবর জানিয়ে দাও। তাকে আরও বলবে, সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে আমি তাকে পূর্ব পদেই বহাল রাখব। আর জেনে রেখো, ইসলাম অনতিবিলম্বে কেছরার সিংহাসন অধিকার করবে।

দূতগণ কয়েকদিন যাবতই মহানবীর কথাবার্তা আচার-আচরণ সাহাবীগণের আনুগত্য, মান্যতাও সৌজন্য লক্ষ্য করিয়া চমৎকৃত হইতেছিল। আজ মহানবীর মুখে এই দ্ব্যর্থহীন ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করিয়া তাহারা একেবারে হতবাক হইয়া গেল! কথাটা তাহারা একেবারে উড়াইয়া দিতে পারিল না।

সিফির নামে খসরুর একজন দূত কয়েকদিন যাবৎ মনে মনে কেবল ইহাই ভাবিতেছিলেন, ইনি যে একজন নবী তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন সঠিক সিদ্ধান্তেও আসিতে পারিতেছিলেন না। কোন প্রমাণও সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। তিনি অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগিতেছিলেন। মহানবীর ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া তিনি ভাবিলেন ইনি সত্যই নবী কিনা ইহা প্রমাণ করিবার এই তো উপযুক্ত সময়। তিনি তাঁহার সঙ্গীদের বলিলেন, চল ইয়ামেনে যেয়ে আমরা মুহাম্মদের (সাঃ) কথার সত্যতা যাচাই করি। যদি খসরু সত্যি নিহত হয়ে থাকেন, তবে আমরা ইয়ামেনে পৌঁছেই সে খবর পেয়ে যাব।

অতঃপর তাহারা ইয়ামেনে উদ্দেশে মদীনা ত্যাগ করিল। কিন্তু সিফিরের মনটি পড়িয়া রহিল মদীনার মসজিদ প্রাঙ্গণে।

খসরু মহানবীর নামে গ্রেফতারী পরওয়ানা বাজান বরাবর পাঠাইবার কয়েকদিন পরের ঘটনা।

একদিন যুবরাজ শেরওয়াঁ পিতৃ সকাশে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মদীনায় মুহাম্মদের নামে গ্রেফতারী পরওয়ানা পাঠানো ভাল হয়নি পিতা। কারণ খবর

পাওয়া গেছে যে, মুহাম্মদের পত্র পেয়ে আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাসী ইসলাম গ্রহণ করেছেন। মিশর সম্রাট মাকাকিউছও পত্র পেয়ে স্বধর্ম ত্যাগের চিন্তা-ভাবনা করছেন। সম্রাট হেরাক্লিয়াসের নামেও তিনি ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে পত্র পাঠিয়েছেন।

শেরওয়াঁ আরও কিছু বলিতে চাহিয়াছিলেন. কিন্তু বলিতে পারিলেন না। খসরু পারভেজ পুত্রের কথার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া গর্জন করিয়া উঠিলেন, নাজ্জাসী, মাকাকিউছ, হেরাক্লিয়াস ও সব নাছারাদের সঙ্গে আমাকে তুলনা করছ শেরওয়াঁ। আর নাজ্জাসীর মতিভ্রম ঘটেছে বলেই কি আমারও তাই হবে বলে মনে কর? সেদিন বারংবার আমি তোমাকে নিষেধ করেছি যে, আমার দরবারে যেন সেই মেষ-রাখালের নাম আর উচ্চারণ করা না হয়; আর কিনা তুমি আমার পুত্র ও ভাবী সম্রাট হয়ে সেই নিষেধ অমান্য করে দরবারে তার নামটাই উচ্চারণ করছ, আর অপবিত্র করছ দরবারের পরিবেশ। আমাকে মন্ত্রণা দিচ্ছ স্বধর্ম ত্যাগের। যাও! বেরিয়ে যাও আমার সম্মুখ থেকে। আমি তোমাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করলাম। আমার মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র দিদার বক্স। আগামীকল্য হবে এর দলিল সম্পাদন।

শেরওয়াঁ ক্ষুণ্ন মনে দরবার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন বটে, কিন্তু নিচেষ্ট রহিলেন না। উত্তরাধিকার দলিল সম্পাদন করিবার পূর্বেই তাঁহাকে সিংহাসন রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাই তিনি মন্ত্রীপরিষদ ও সভাসদগণের সাথে এই মর্মে গোপন পরামর্শ করিতে লাগিলেন। বলাবাহুল্য, মন্ত্রী পরিষদ ও সভাসদগণ খসরু পারভেজের পরে শেরওয়াঁকেই তাহাদের সম্রাট হিসাবে মনে করিয়া আসিতেছে। সদাচারী শেরওয়াঁর পরিবর্তে অসদাচারী দিদার বক্সকে কেহই সিংহাসনে দেখিতে চায় না। কাজেই মন্ত্রী পরিষদ ও সভাসদবর্গ সহজেই শেরওয়াঁর পক্ষ সমর্থন করিল। স্থির হইল, অদ্য রাত্রেই ঘুমন্ত অবস্থায় খসরু পারভেজকে হত্যা করিতে হইবে। হইলও তাহাই।

শেরওয়াঁ অন্য লোক দ্বারা ঘাটের মরা পিতাকে হত্যা করিয়া তৃতীয় ইয়াজদিগার্দ নাম ধারণ করতঃ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। খসরু পারভেজ মহানবীর পত্র ছিঁড়িয়া ফেলার প্রতিফল এইভাবে লাভ করিলেন।

ইয়াজদিগার্দ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই ইয়ামেনের শাসনকর্তা বাজানের নিকট আর একটি পত্র লিখিলেন। পত্রটি নিম্নরূপ ঃ

"আমি আমার পিতাকে হত্যা করিয়াছি। কারণ তাঁহার শাসন দুর্নীতি ও অন্যায়গ্রস্ত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার আমির ওমরাদের হত্যা করিয়াছিলেন এবং প্রজাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

এই চিঠি পাওয়ামাত্রই তোমার সমস্ত কর্মচারীকে একত্র কর এবং আমার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ কর।

যে আরবী নবীকে গ্রেফতার করার জন্য আমার পিতা হুকুম দিয়াছিলেন, তুমি সে আদেশকে বাতিল বলিয়া গণ্য করিবে।" (তাবারী, ইবনে হিশাম)

মদীনা হইতে ফেরৎ দূতগণ ও ইয়াজদিগার্দের প্রেরিত দূত একই দিনে ইয়ামেনে বাজানের দরবারে উপস্থিত হইল। দূতগণ পরস্পরের নিকট হইতে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া যেমন বিস্মিত হইল, বাজানও তেমনি হতবাক হইয়া গেলেন! তাঁহারা হিসাব করিয়া দেখিলেন মহানবীর বর্ণিত রাত্রেই খসরু নিহত হইয়াছেন।

বাজান ভাবিতে লাগিলেন, মুহাম্মদের (সাঃ) গ্রেফতারী পরওয়ানা, রাজকর্মচারী, ফৌজ, পুলিশ সমস্তই পাঠানো হইয়াছিল; কিন্তু সবই ব্যর্থ হইয়া গেল। তদুপরি তাঁহার খসরু হত্যার ভবিষ্যদ্বাণী যখন অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইয়াছে তখন তাঁহার অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীও সত্য না হইয়াই পারে না। পারস্য সিংহাসন মুসলমানদের অধিকারে আসিবে, আমি ইসলাম গ্রহণ করিলে আমাকে পূর্বপদে বহাল রাখা হইবে, এই সমস্ত বাণীও মিথ্যা হইতে পারে না। ইয়ামেন এখন নামেমাত্র কেছরার রাজ্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইয়ামেন মদীনার করতলগত। আমি মহানবীর কথাই পালন করিব।

ইতিমধ্যেই বাজানের নিকট খবর পৌঁছিল যে, কাহতানীয়ার জুলকেলা ও ওমানের শাসনকর্তাগণও মহানবীর পত্র পাইয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। বাজান আর কিছুমাত্র দ্বিরুক্তি না করিয়া ইয়াজদিগার্দের পত্রাদেশ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করত মহানবীর নির্দেশকেই শিরোধার্য করিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার দেখাদেখি ইয়ামেনের বহু অগ্নিউপাসক ও খৃষ্টান প্রজা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় লইল।

সিফিরের আর কোন সংশয় রহিল না। দেশের মায়া পরিত্যাগ করিয়া সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া মোস্তফা চরণে নিবেদিত হইবার জন্য তিনি মদীনায় যাত্রা করিলেন।

অন্যান্য দূত ইয়াজদিগার্দের রাজধানী মাদায়েনে ফিরিয়া গেল। প্রত্যাগত দূতদের মুখে মহানবীর ভবিষ্যদ্বাণী বাজানের ইসলাম গ্রহণ ও সিফিরের মদীনা প্রত্যাবর্তনের কথা শুনিয়া ইয়াজদিগার্দ ভাবান্বিত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন এই লোক নিশ্চয়ই নবী! তাহা না হইলে আমার পিতৃহত্যার কাহিনী ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিতেন না। আমার রাজ্য সম্বন্ধে তাঁহার যে ভবিষ্যদ্বাণী তাহাও নিশ্চয় ফলিবে এবং আমার সিংহাসনও তাঁহার করতলগত হইবে।

এমতাবস্থায় আমিও যদি বাজানের মত ইসলাম গ্রহণ করি, তবে হয়ত তিনি দয়া করিয়া আমাকেও নিজ পদে বহাল রাখিতে পারেন। এইরূপ চিন্তা-ভাবনা করিয়া ইয়াজদিগার্দ তাঁহার মন্ত্রী পরিষদ ও সভাসদবর্গকে ডাকিয়া এই ব্যাপারে পরামর্শ চাহিলেন।

পরিষদের একজন বলিল, রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের কাছে যখন মুহাম্মদের (সাঃ) পত্র পৌছে, তখন আমি সেখানে ছিলাম। রোম সম্রাটও তখন প্রথমে স্বধর্ম ত্যাগের চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। কিন্তু জনতার চাপে ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ ভেবে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পাল্টিয়েছেন। আমাদেরও এভাবে হঠাৎ কিছু না করে পরিস্থিতি লক্ষ্য করে যাওয়াই উচিত। তাছাড়া আমরাও আপনাকে হঠাৎ কিছু করে ফেলার সিদ্ধান্ত দিতে পারি না। কারণ এটা আমাদের টিকে থাকার প্রশ্ন ও ইজ্জতের ব্যাপার।

মন্ত্রী পরিষদ ও সভাসদবর্গ সকলেই এই কথা সমর্থন করিল। ইয়াজদিগার্দের ইহা না মানিয়া আর অন্য উপায় ছিল না। কারণ পিতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিবার পিছনে ইহাদের জোর সমর্থন ছিল। কাজেই ইহাদের অমতে কিছু করিবার মত শক্তিও তাঁহার ছিল না।

সুতরাং যে ইয়াজদিগার্দ নূরে হেরায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই পিতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন, মহানবীর প্রতি শ্রদ্ধাবনত হইয়াই বাজানের নিকট পাল্টা পত্র পাঠাইলেন, সেই ইয়াজদিগার্দও শেষ পর্যন্ত মত পরিবর্তন করিয়া রাজ্য ও সিংহাসন রক্ষার চিন্তায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

২

অন্ধকার ঘরে যেমন কানাতের ছিদ্রপথে আলোর রশ্মি প্রবেশ করিয়া অন্ধকারকে বিদূরিত করিতে প্রয়াস পায়, তেমনি অগ্নি-উপাসক কেছরা রাজপুরীর অধর্মের অন্ধকারে একটি ছিদ্রপথে সকলের অলক্ষ্যে হেরার জ্যোতি প্রবেশ করিল। যেদিন ইয়াজদিগার্দের দরবারে মদীনা ফেরত দূতগণ মহানবীর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা, কার্যকলাপ, কথাবার্তা ও আচার-আচরণের সমুদয় কাহিনী ব্যক্ত করিতেছিল তখন সম্রাট ইয়াজদিগার্দের দ্বিতীয় পক্ষের দশম বর্ষীয়া অনিন্দ সুন্দরী বুদ্ধিমতী কন্যা শাহেরবানু পিতার সাথে সিংহাসনে বসিয়া তন্ময় হইয়া শুনিতেছিলেন সেই কাহিনী আর ভাবিতেছিলেন কেমন সেই নবী, কেমন তাঁহার ধর্ম, কেমন তাঁহার দরবার! তাঁহার খসরু হত্যার কাহিনীর ভবিষ্যদ্বাণী যখন সত্য হইয়াছে তখন আমাদের রাজ্য ও সিংহাসন দখলের ভবিষ্যদ্বাণীও মিথ্যা হইবে না। আহা! আমি যদি তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম' বালিকার চঞ্চল মনে জাগিয়া উঠিল একটি বিরাট জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল।

শাহেরবানু হলদে প্রজাপতির মত উড়িয়া ছুটিয়া মাতৃসকাশে যাইয়া বলিতে লাগিলেন, শুনেছ মা! মদীনার সেই মহানবী আমাদের প্রাসাদ ও সিংহাসন অধিকার করতে আসবেন। তখন খুবই মজা হবে, তাই না আম্মি? আমি তাঁকে দেখতে পারব, বাহ্! কি মজা। জান মা! তিনি নাকি আব্বার মত দাড়ি কাটেন না, শুধু গোঁফ ছোট করে রাখেন। আচ্ছা আম্মি! আব্বা যদি দাড়ি না কাটতেন তবে আব্বাকেও নিশ্চয়ই মহানবীর মত দেখাত! তাই না! আর তাঁর যত দরবারী আছেন সবারই নাকি গাল ভর্তি দাড়ি।

দিলরাজ বানু এইসব কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এসব তুই কি বলছিস শাহের বানু? আমি যে এর কিছুই বুঝতে পারছি না!

শাহেরবানু মায়ের মাথায় ঝাঁকি দিয়া বলিলেন, তুমি কিছু জান না মা। শোন আমি বলছি! এই বলিয়া শাহেরবানু দরবারে যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন একে একে সমস্তই মায়ের কাছে বর্ণনা করিলেন। বিস্তারিত শুনিয়া দিলরাজবানু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি শাহেরবানুকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিলেন, খবরদার, এসব কথা আর কখনও বলবে না! তোর আব্বা শুনলে তোকে মেরে ফেলবেন।

শাহেরবানু যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লাইয়া মায়ের কাছে আসিয়াছিলেন এখন মায়ের কথা শুনিয়া সেই উৎসাহ-উদ্দীপনা সবই বুদ্বুদের মতই শূন্যে মিলাইয়া গেল। এইসব কথা বলিলে কি অপরাধ হয়, কেনই বা পিতা তাঁহাকে মারিয়া

ফেলিবেন. শাহেরবানু এই সবের কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না বটে। তবে ইহা বুঝিতে পারিলেন যে. মা যাহা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন তাহা অবশ্যই বলা চলিবে না। বলিলে ক্ষতি হইতে পারে।

মায়ের কথায় শাহেরবানুর মুখ সাময়িকভাবে বন্ধ হইল বটে. কিন্তু মহানবীর কথা, মদীনার কথা এবং ইসলাম কি- এই সবের এক বিরাট জিজ্ঞাসার বীজ তাঁহার কচি মনে রোপিত হইল। যে শাহেরবানু সারাটি দিন প্রজাপতির মত সমস্ত বাড়ীময় ছুটিয়া বেড়াইতেন. সেই শাহেরবানু কেমন যেন গম্ভীর হইয়া উঠিলেন! হৈ রৈ ও ছুটাছুটি করিয়া কাহারো বিরক্তির কারণ হইয়া উঠেন না। অনর্গল কথা বলিয়া বা অহেতুক প্রশ্ন করিয়া কাহাকেও অস্থির করিয়া তুলেন না। তাঁহার সঙ্গে খেলিবার কাহাকেও আর ধরিয়া বসেন না. এক জায়গায় বসিয়া বসিয়া চুপ করিয়া কি যেন শুধু ভাবেন! খাবার সময় তাঁহাকে ডাকিয়া খুঁজিয়া আনিতে হয়। কিন্তু সকাল বিকাল গৃহশিক্ষকের কাছে মনোযোগ সহকারেই লেখাপড়া করিতেন।

মেয়ের ভাবান্তর দেখিয়া চিন্তিত হইলেন বটে। কিন্তু ভাবান্তরের কোন কারণ উদ্‌ঘাটন করিতে না পারিয়া সম্রাটকে তাহা জানাইলেন। সম্রাট পারিবারিক চিকিৎসককে শাহেরবানুর চিকিৎসা করিতে নির্দেশ দিলেন। চিকিৎসক পরীক্ষা- নিরীক্ষা করিয়া শাহেরবানুর কোন রোগ নির্ণয় করিতে ব্যর্থ হইয়া কিছু বলকারক ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ইহাতে শাহেরবানুর বিশেষ কোন উপকার হইল না বটে. কিন্তু দিলরাজবানু আশ্বস্ত হইলেন যে. এইবার মেয়ের ভাবান্তর ঘুচিবে।

দুই বৎসর পরের কথা। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে শাহেরবানুর কৌতূহলও বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। এমনিভাবেই কি তাঁহার জিজ্ঞাসার অপমৃত্যু ঘটিবে? কিন্তু উপায়? শাহেরবানু নিজেই উপায় খুঁজিয়া বাহির করিলেন। একদিন শাহেরবানু মায়ের কাছে যাইয়া বলিলেন. চল না মা! মামাদের বাড়ী থেকে বেড়িয়ে আসি গে।

যে মেয়েকে বলিয়া কহিয়াও মামার বাড়ী পাঠানো যাইত না, সেই মেয়ে আজ স্বেচ্ছায় কেন মামার বাড়ী যাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে, দিলরাজবানু তাহা বুঝিতে না পারিয়া মেয়ের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন।

মায়ের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া শাহেরবানু বলিলেন. তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ মা! সিফির মামা মদীনাতেই রয়ে গেছেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এরই মধ্যে যদি তিনি বাড়ী এসে থাকেন তবে তাঁর কাছ থেকে মহানবীর কথা, মদীনার কথা এবং ইসলামের অনেক কিছু নিশ্চয় শুনতে পাব। কাজেই চল মা! মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া শাহেরবানু নাকি সুরে আব্দার জুড়িয়া দিলেন।

মেয়ের কথা শুনিয়া দিলরাজবানু যেন আকাশ হইতে পড়িলেন! এতদিনে তিনি বুঝিতে পারিলেন মেয়ের ভাবান্তরের কারণ। তিনি শাহেরবানুকে কোলে টানিয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন, তুই এখনও সেই কথাই ভাবছিস? এক রত্তি মেয়ে তুই, এতসব বড় বড় ভাবনা কেন? ওসব মন থেকে দূর করে ফেল। তোর আব্বা শুনলে আর রক্ষা থাকবে না। তোর সেখানে যাওয়া চলবে না, বলে দিচ্ছি!

শাহেরবানু বলিলেন, আমি তো আর কারো কাছে যাচ্ছি না, যাচ্ছি মামার কাছে। আর এ কথাটি তুমি ছাড়া আর কারো কাছেই বলিনি। আমাকে মামাদের বাড়ীতে নিয়ে চল মা, আমি কথা দিচ্ছি, আমি তোমার সাথেই চলে আসব। আর যদি তুমি যেতে না চাও তবে আমাকে সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা কর। আমি শুধু সিফির মামার খবরটা নিয়েই চলে আসব।

মায়ের জাত আছে বলিয়াই পৃথিবীতে এখনও মায়া-মমতা আছে, স্নেহ-ভালবাসা আছে, ধর্ম আছে। দিলরাজবানু শেষ পর্যন্ত মেয়ের পক্ষ সমর্থন না করিয়া পারিলেন না। শাহেরবানুর আব্দারের মুখে নতি স্বীকার করিয়া সম্রাটের অনুমতিক্রমে দুইদিন পর দুইজন পরিচারিকাসহ শাহেরবানুকে মামার বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

মাদায়েনের উপকণ্ঠেই ছিল সিফিরের বাড়ী। শাহেরবানু যখন মামার বাড়ী পৌঁছিলেন তখন বেলা এক প্রহর। মামানী জিনিয়া ছুটিয়া আসিয়া শাহেরবানুকে কোলে তুলিয়া নিলেন। আদর করিয়া শরীরের ঘাম মুছিয়া দিয়া বলিলেন, শাহজাদীর আগমনে আমাদের বাড়ী ধন্য হল!

শাহেরবানু বলিলেন, তা ঠিক নয়, মামানী, বরং আমি নিজে ধন্য হতে এসেছি।

জিনিয়া বলিতে লাগিলেন, শোন বেটীর কথা!

কোনদিন আসনি, আজ যে এসেছ, এটাই আমাদের ভাগ্য। যদি আসলেই তবে তোমার আম্মি, গুলবানু ও পরীবানুকে নিয়ে এলে না কেন? গুলবানু ও পরীবানু ছিলেন শাহেরবানুর বড় দুই বৈমাত্রীয় বোন। কিন্তু সিফির ও জিনিয়া তাহাদেরকেও অত্যধিক স্নেহ করিতেন। তাই তিনি তাহাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

শাহেরবানু জিনিয়ার গন্ড চুম্বন করিয়া বলিলেন, তারা কেউ এলেন না যে, আমি এসেছি মামার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি যে অনেকদিন আমাদের বাড়ী যান না!

শাহেরবানুর কথায় জিনিয়ার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন কি উত্তর দিবেন। শাহেরবানু এখন দ্বাদশী। কাজেই সব

কথাই তিনি বুঝিতে পারেন। জিনিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, মামা যে মদীনায় চলে গেছেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তা আমি জানি। আমি শুধু জানতে এসেছি, তিনি কবে বাড়ীতে আসবেন। আমি যে তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে চাই, মামানী!

শাহেরবানুর খানাপিনার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া জিনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তাঁর কাছ থেকে কি জানতে চাও শাহজাদী?

পানাহার করিতে করিতে শাহেরবানু বলিলেন, জানতে চাই ইসলামের কথা, মহানবীর কথা।

শাহেরবানুর নিঃসংকোচ কথা শুনিয়া জিনিয়া চমৎকৃত হইলেন। তিনি বলিলেন, এ কথা তোমার আব্বা শুনলে তোমার বিপদ হবে শাহজাদী। সম্রাট তোমার মামাকে বিদ্রোহী প্রজা ঘোষণা করেছেন এবং তাঁকে বন্দী করার জন্য আমাদের বাড়ীর চারপাশে চর নিযুক্ত করেছেন। এমতাবস্থায় তোমার কথা যদি

শাহেরবানু বাধা দিয়া বলিলেন, সে ভয় আমি করিনে মামানী, ভয় হচ্ছে মামা যদি ধরা পড়েন তবে আমার সবই বৃথা যাবে।

জিনিয়া নিরুত্তর। শাহেরবানু একটু চুপ থাকিয়া বলিলেন, মামার কোন খবর কিন্তু এখনও বলেন নি। শাহেরবানুর কথায় কোন দুরভিসন্ধি না বুঝিতে পারিয়া জিনিয়া বলিলেন, ছ-মাস পূর্বে একবার তিনি বাড়ীতে এসেছিলেন এবং সম্রাটের চরদের হাতে প্রায় ধরা পড়েছিলেন আর কি! রাতের অন্ধকারে প্রাচীর টপকে কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেছেন। আজ রাত্রে আবার আসবার কথা। খবর শুনিয়া শাহেরবানুর মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ পরিচারিকাদের ডাকিয়া বলিলেন, তোরা বাড়ী চলে যা। মাকে বলবি আমি আগামীকল্য বাড়ী যাব। পরিচারিকারা বাড়ীতে চলিয়া গেল। শাহেরবানু জিনিয়াকে ইসলাম ও মহানবী সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। জিনিয়াও যথাসম্ভব তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে কুণ্ঠিত হলেন না। কিন্তু তাঁহার উত্তরে শাহেরবানু মোটেই পরিতৃপ্ত হইতেছেন না দেখিয়া জিনিয়া বলিলেন, আমিও স্বামীর পদাংক অনুসরণ করেছি বটে শাহজাদী, কিন্তু তোমার এত সব জটিল প্রশ্নের উত্তর দেবার মত ইসলামী জ্ঞান এখনও আমার হয়নি। ধৈর্য ধারণ কর বেটী, তোমার মামা এলেই সব উত্তর পাবে।

জিনিয়ার নামাজ পড়া দেখিয়া শাহেরবানুর কৌতূহল আরও বাড়িয়া গেল। তিনি জিনিয়ার নিকট হইতে নামাজ কি, কেমন করিয়া তাহা পড়িতে হয় ইত্যাদি অনেক খুঁটিনাটি বিষয় জানিতে লাগিলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। শাহেরবানুর চোখে নিদ্রা নাই। তিনি শায়িতা জিনিয়াকে ডাকিলেন, মামানী জেগে আছেন কি? স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় জিনিয়ার চোখের ঘুম নাই তিনি সাড়া দিলেন, কেন বেটী?

মামা কি তা হলে আর আসবেন না? রাত যে অনেক হল?

জিনিয়া বলিলেন, কথা দিয়ে গেছেন যেহেতু, অবশ্যই আসবেন। তবে কিনা একটু বেশী রাত হলে আশা নিরাপদ। শেষ রাত্রের দিকে যখন প্রহরীরা বসে বসে ঢুলতে থাকে তখন এক ফাঁকে পাঁচিল টপকে বাড়ীতে ঢুকে পড়বেন।

কিছুক্ষণ পরেই দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দ হইল। পরিচিত সংকেত পাইয়া জিনিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। প্রদীপ জ্বালানোই ছিল। ঘরে প্রবেশ করিলেন সিফির। জিনিয়া স্বামীর কদমবুছি করিলেন। সাথে সাথে শাহেরবানুও।

কোথায় সেই মোটা গোঁফ আর দাড়ি কামানো সিফির অগ্নিউপাসক বিধর্মী। আর কোথায় এই গোঁফ কাটা,শুশ্রুমন্ডিত মুসলমান সিফির মামা। শাহেরবানু যেন চিনিতেই পারিতেছেন না। তিনি সিফিরের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। সিফিরও প্রথমটায় ঠাহর করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে?

জিনিয়া বলিলেন, শাহজাদী শাহেরবানু ।

সিফিরের বিস্ময় মাখা কণ্ঠ, শাহের বানু?

শাহেরবানু আগাইয়া আসিয়া বললেন, হ্যাঁ মামা। আমি যে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এসেছি। আমার যে অনেক জিজ্ঞাসা, অনেক প্রশ্ন!

ইতিমধ্যেই জিনিয়া স্বামীর জন্য খানাপিনার এন্তেজাম করিয়া আনিলেন। সিফির পানাহার করিয়া শান্ত হইয়া বলিলেন, এবার বল বেটী, তোর কি জিজ্ঞাসা।

শাহেরবানু বলিলেন, আমার প্রশ্ন আর কিছুই নয় মামা। যে মহাসত্যের সন্ধান আপনি পেয়েছেন, আমি শুনতে চাই সে মহাসত্যের কথা, মহানবীর কথা; তিনি কেমন, কেমন তাঁর ধর্ম?

শাহেরবানুর কথা শুনিয়া সিফির স্থাণুর মত স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এই বালিকা বলে কি! তিনি সস্নেহে প্রশ্ন করিলেন, এ প্রসঙ্গ তুই কোথায় শুনলি বেটী? এর কী-ই বা তুই বুঝবি!

শাহেরবানু কোথায় ইহা শুনিয়াছেন তাহার পূর্ণ বিবরণ দিয়া বলিলেন, বিষয়টি পুরাপুরি বোঝবার জন্যই সেদিন হতে আমি আপনার জন্য অধীর অপেক্ষায় আছি। বিস্তারিতভাবে সব আপনার কাছ থেকে শুনব। আমার যে ওসব

জানবার খুবই আগ্রহ! আচ্ছা মামা, মহানবী কবে আসবেন আমাদের রাজ্য আর সিংহাসন দখল করতে? আমি যে তাঁকে দেখতে চাই!

শাহেরবানুর কথায় সিফির হাসিয়া বলিলেন, তাঁর এ ভবিষ্যদ্বাণীও সত্য হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু কবে হবে, তাঁর জীবদ্দশায় আদৌ হবে কিনা এ সব এখনও বলা যাবে না। কিন্তু ভাবছি বেটী তোর কথা। তুই যেন আবু ছুফিয়ানের ঘরে উম্মে হাবিবা!

বিস্মিত কণ্ঠ শাহেরবানুর! আবু ছুফিয়ান? উম্মে হাবিবা? এঁরা কে মামা?

মুক্তির নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রাণের দুশমন আবু ছুফিয়ান। সে মক্কার কোরাইশ সরদার। সে কয়েকবার মহানবী ও ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। অথচ তার মেয়ে উম্মে হাবিবা হলেন মহানবীর অন্যতম এক সহধর্মিণী।

মেয়ে মুসলমান মহানবীর স্ত্রী? আর পিতা কাফের, কি আশ্চর্য!

না বেটী! আবু ছুফিয়ান এখন আর কাফের নন। এই তো কিছুদিন হলো মহানবীর মক্কা বিজয়ের সময় আবু ছুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

বলেন কি মামা! মক্কা এখন মহানবীর করতলগত? শুনেছিলাম জন্মভূমি মক্কা হতে কোরাইশরা তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিল?

হাঁ বেটী! কিন্তু বিগত ১৮ই রমজান দশ হাজার মুজাহিদ নিয়ে তিনি মক্কা অভিযানে বের হন এবং এক প্রকার বিনা রক্তপাতেই মক্কা বিজয় সমাপ্ত হয়। ৩৬০টি মূর্তি কাবাঘর হতে অপসারণ করা হয়। কাবাশীর্ষে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করা হয়েছে। ঘোষণা করা হয়েছে বিজয়সূচক আজান ধ্বনি। সমগ্র আরবে এখন ইসলাম ও মহানবীর জয় জয়কার! ইসলাম এখন আরবের একমাত্র স্বীকৃত ধর্ম।

আপনি এত খবর রাখেন মামা?

মক্কা বিজয়াভিযানে মহানবীর সাথে আমারও যে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল! হুনায়নের যুদ্ধ, তায়েফ অভিযান এসব ক'টিতে মহানবীর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

মহানবীর পরিবারবর্গের কারো সাথে কি মামার পরিচয় হয়নি?

আল্লাহর অসীম মেহেরবানী। তাঁর পরিবারের দু-একজনের সাথেও সাক্ষাত পরিচয় হয়েছে। আল্লাহর অসীম - - - - -

শাহেরবানু সোৎসাহে বলিলেন, আহা! আমি যদি তাঁদের সাথে পরিচিত হতে পারতাম! একটু চুপ থাকিয়া শাহেরবানু আবার প্রশ্ন করিলেন, উম্মে হাবিবা ছাড়া মহানবীর অন্যান্য সহধর্মিণী আর কে কে আছেন? তাঁর পরিবারের কার কার সাথে আপনার পরিচয় হয়েছে মামা?

সিফির হযরত খাদিজাতুল কুবরা হইতে আরম্ভ করিয়া হযরত মায়মুনা (রাঃ) পর্যন্ত সকল উম্মাহাতুল মোমেনীনের পরিচয় একে একে বর্ণনা করিলেন।' নবী পরিবারের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত হাসান, হোসাইন (রাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে ইহাও বলিলেন।

নবী পরিবারের পরিচয় শুনিতে শুনিতে শাহেরবানু তন্ময় হইয়া পড়িলেন, সিফিরের কথা শেষ হইলে তিনি বলিতে লাগিলেন, আমি যেন তাঁদের সকলকে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাচ্ছি মামা। আহা! কতই না সুন্দর তাঁদের জীবন কাহিনী! কতই না ধন্য তাঁরা! শাহেরবানু কি যেন একটু ভাবিয়া আবার বলিলেন, মহানবীর কোন পুত্র-সন্তান যেহেতু জীবিত নেই, তবে তাঁর বংশ রক্ষা হবে কিভাবে?

সিফির বলিলেন, মহানবী বলেছেন, তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) হতেই তাঁর বংশ বিস্তার লাভ করবে।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-র কে আছেন।

ঐ তো, হযরত হাসান ও হোসাইন তাঁরই নয়ন পুত্তলী। মহানবী তাঁদের প্রাণাধিক স্নেহ করেন। সে স্নেহের কোন তুলনা নেই। কোলে নিয়ে বেড়ান, কাঁধে নিয়ে ফেরেন, দু'জনকে দু' উরুতে বসিয়ে রাখেন। মনে হয় যেন পূর্ণ চন্দ্রের কোলে দুটি ক্ষুদে চাঁদ। মাঝে মাঝে নানানাতির রসিকতাও হয়। কোন কোন দিন রসিকতায় নাতি নানাকেও হারিয়ে দেন।

শাহেরবানু কৌতূহলে প্রশ্ন করিলেন, কেমন সে রসিকতা মামা?

তবে শোন বেটী। সিফির বলিতে লাগিলেন, একদিন হযরত হোসাইন (রাঃ) মহানবীকে প্রশ্ন করিলেন, বলুন তো নানাজী কে বেশী শ্রেষ্ঠ– আপনি না আমি?

মহানবী হাসিয়া বলিলেন, আমি বেশী শ্রেষ্ঠ যেহেতু আল্লাহর নবী ও রাছুল।

হযরত হোসাইন হাত নাড়িয়া বলিলেন, হল না নানাজী, হল না। আমি বেশী শ্রেষ্ঠ।

মহানবী হাসিয়া বলিলেন, কেমন করে বল দেখি ভাই?

হযরত হোসাইন (রাঃ) নানাজীর কোলে বসিয়াই বলিতে লাগিলেন, তাহলে শুনুন, আমার পিতা পৃথিবীর প্রথম পুরুষ মুসলমান ও শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ)। আর আপনার পিতা আব্দুল্লাহ কিছুই না। একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন মাত্র। আমার আম্মা হযরত ফাতেমা (রাঃ) বিশ্বনবীর কন্যা, খাতুনে জান্নাত বা বেহেস্তের মেয়েদের সর্দার আর আপনার আম্মা বিবি আমিনা ছিলেন একজন সাধারণ মেয়ে মানুষ, তাঁর কোন বৈশিষ্ট্যই ছিল না। আমার নানা হলেন ছরওয়ারে কায়েনাত, রাহমাতুল্লিন আলামিন, খাতামুন নাবেয়ীন হযরত মুহাম্মদ

(সঃ)। আর আপনার নানা আব্দুল ওয়াহাবকে কেউ চেনেন না। আমার নানী হলেন পৃথিবীর প্রথম মুসলমান হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ), আর আপনার নানী বাররাহর কোন বিশেষত্বই নেই। আমি ও ভাই হযরত হাসান (রাঃ) হব বেহেস্তের যুবকদের সর্দার। কিন্তু আপনি তাও হতে পারলেন না। এবার বলুন তো নানাজী কে বেশী শ্রেষ্ঠ?

মহানবী মহানন্দে হযরত হোসাইনের গন্ডে কপালে চুমা খাইয়া বলিলেন, হ্যাঁ, নানাজী। তুমিই বেশী শ্রেষ্ঠ। তোমার প্রতিটি কথাই সত্য। এই অনাবিল মধুর কাহিনীটি শুনিয়া শাহেরবানুর চোখে মুখে এক অন্তহীন পুলকতা নামিয়া আসিল। তিনি কল্পনার চোখে সেই ক্ষুদে বিজয়ীর কমনীয় কায় ও চন্দ্রমুখখানি দেখিতে লাগিলেন।

সিফির কি একটি কাজে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে পুনঃপ্রবেশ করিতেই শাহেরবানু আবার প্রশ্ন করিলেন, আপনাকে ছাড়া মদীনায় আমাদের দেশের আরও কেউ আছেন কি?

সিফির বলিলেন হ্যাঁ, বেটী! বিখ্যাত সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) আমাদের পারস্যের লোক। তিনি মহানবীর কথা শুনে সেই যে মোস্তফা চরণে নিবেদিত হতে গিয়েছিলেন অদ্যাবধি আর দেশে ফিরে আসেন নি। তাঁর পরামর্শ মত কাজ করেই মুসলমানগণ পরিখার যুদ্ধে জয় লাভ করেন।

কথোপকথনে রাত প্রায় শেষ হইয়া আসিল দেখিয়া সিফির বলিলেন, রাত শেষ হবার পূর্বেই তোমার মামানীকে নিয়ে গোলাম। কাফুরসহ আমি মদীনার পথে মাদায়েন ত্যাগ করছি। কাজেই আমাদের এখনি বের হতে হবে বেটী। দিনের বেলা বের হলে সম্রাটের চরদের হাতে ধরা পড়ার আশংকা আছে। তুমি সকালে পাশের বাড়ীর নাদিরাকে নিয়ে বাড়ী চলে যেও।

সিফিরের কথা শুনিয়া শাহেরবানু আনন্দে লাফাইয়া বলিলেন, আমি আর কখনও বাড়ী যাব না। আমাকেও আপনাদের সঙ্গে মদীনায় নিয়ে চলুন মামা। সত্য সন্ধানে বের হবার ও মহানবীকে দেখার এমন সুযোগ আমি হাতছাড়া করতে রাজী নই।

সিফির বিভিন্নভাবে বুঝাইয়া শাহেরবানুকে নিরস্ত করিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি পণে অটল।

অধিকন্তু তিনি বলিলেন, যদি আমাকে আপনার সঙ্গে না নেন, তাহলে বলব আপনিই আমাকে সত্য গ্রহণে বাধা দিলেন। সিফির কিছুক্ষণ শাহেরবানুর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, আল্লাহ বলেন,

'ওমা তাশাওনা আল্লা আঁই য়াশা আল্লাহ।' তোমরা কিছুই আশা করিতে পার না কিন্তু আল্লাহ যাহা করেন তাহাই হয়।

চল বেটী! কিন্তু মনে রাখিস এ পথে বহু দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনা আছে।

জিনিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কাফুর প্রভুর নির্দেশমত দুইটি উট প্রস্তুত করিল।

সিফির শাহেরবানুকে ইসলামে দীক্ষিত করিয়া সূরায়ে ফাতেহা ও সূরায়ে বাকারার প্রথম রুকুর ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন, তিনি ইসলামের অন্য দিকগুলিও বিশদভাবে শাহেরবানুকে বুঝাইতে লাগিলেন। তৃষ্ণার্ত চাতকীর মতই শাহেরবানু সেই অমিয় সুধা পান করিয়া তৃপ্ত হইতে লাগিলেন এবং এক নতুন জীবন লাভ করিলেন।

যাত্রার আয়োজন শেষ হইল। ভাগাভাগি করিয়া মোট-ঘাট দুইটি উটে বোঝাই দেওয়া হইল। সিফির ও কাফুর একটিতে, অপরটিতে জিনিয়া ও শাহেরবানু আরোহণ করিলেন। বলা বাহুল্য, কাফুর আগেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল।

রাত্রি তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই ক্ষুদ্র কাফেলাটি নূরে হেরায় উদ্ভাসিত হইয়া বিত্ত-বৈভব, আত্মীয়-স্বজন ও জন্মভূমির মায়া কাটাইয়া মদীনার পথে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের মুখে কালেমায়ে শাহাদৎ এবং বুকে ইসলামী জোশ্।

৩

জুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। তখনও মাদায়েন জাগিয়া উঠে নাই। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চন্দ্রালোকে প্রহরীদের চক্ষুকে ফাঁকি দিবার জন্য তাঁহারা অলি গলির পথ ধরিয়া দ্রুত শহর এলাকা ছাড়াইয়া যাইতেছেন। কিন্তু তাহা বুঝি আর হইয়া উঠিল না! মুক্ত কৃপাণ হস্তে দুইজন প্রহরী অন্ধকার হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল এবং বজ্র কণ্ঠে হাঁকিল, তোমরা কে? পথিক? কোথায় যাবে?

নির্ভীক কণ্ঠে সিফির উত্তর দিলেন, পথ ছেড়ে দাঁড়াও আমরা মদীনার পথিক।

গম্ভীর কণ্ঠে একজন প্রহরী বলিল, মাদায়েন হতে মদীনা? পরিচয় না দেওয়া পর্যন্ত আর এক পদও অগ্রসর হতে পারবে না। ইত্যবসরে অপর প্রহরী সিফিরের উটের গলায় ফাঁস পরাইয়া ফেলিল। ফাঁসের রজ্জু হস্তগত করিবার জন্য সিফির লাফাইয়া নীচে নামিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রহরী তাঁকে আক্রমণ করিল। প্রহরীদের একজন সিফিরের পদাঘাতে ছিটকাইয়া দূরে যাইয়া পড়িল এবং জ্ঞান হারাইল। অন্যজনকে কাবুতে পাইয়াও সিফির তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন মুসলমান অনর্থক নরহত্যা করে না, যা! তোকে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আরো কয়েকজন প্রহরী ছুটিয়া আসিয়া একযোগে সিফিরকে আক্রমণ করিল। প্রভুকে রক্ষা করিবার জন্য কাফুরও লাফাইয়া নীচে নামিয়া আসিল। শুরু হইল ভীষণ যুদ্ধ। শত্রুদল সংখ্যায় ভারী হওয়ায় তাঁহারা বেশীক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারিলেন না। উভয়েই বন্দী হইলেন।

পূর্বাকাশ রঙিন হইয়া উঠিয়াছে। প্রহরিগণ উট ও বন্দীদের রাজদরবারের দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। ঘটনার আকস্মিকতায় শাহেরবানু ভীষণ ভয় পাইয়া গেলেন। তিনি জিনিয়াকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, কি উপায় হবে মামানী!

জিনিয়া বলিলেন, ভয় নাই শাহজাদী! সত্যসেবক মুসলমান একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া আর কাহাকেও ভয় পায় না। ধৈর্য ধারণ কর, আল্লাহ ধৈর্য ধারণকারীদের সঙ্গে আছেন। তিনি আমাদের অমঙ্গল করবেন না। জয় আমাদের সুনিশ্চিত!

জিনিয়ার কথায় শাহেরবানুর সমস্ত ভয় বিদূরিত হইল। তিনি আল্লাহর নামে ধৈর্য ধারণ করিলেন। প্রহরিগণ সকালে বন্দীদের সম্রাটের দরবারে হাজির করিল এবং বলিল যে, ইহারা মদীনার যাত্রী; তাহারা সম্রাটকে আরও জানাইল যে,

উটের হাওদায় দুইজন জেনানাও রহিয়াছে। জেনানাদেরকেও দরবারে হাজির করিবার জন্য সম্রাট নির্দেশ দিলেন। প্রহরিগণ তাহাই করিল।

বন্দী সিফিরকে দেখিয়াই সম্রাটের মেজাজ এমনিতেই চরমে উঠিয়াছিল, এইবার জিনিয়ার সাথে শাহেরবানুকে দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না তিনি ভাবিয়াই পাইলেন না ইহাদের সাথে শাহেরবানু যোগ হইল কেমন করিয়া! তিনি ভাবিলেন নিশ্চয়ই সিফির শাহেরবানুকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছিঁল। ইহা মনে হইতেই সম্রাটের অবস্থা যেন আগুনে ঘৃতাহুতি হইল! তিনি সিফিরকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, তুমি শাহেরবানুকে চুরি করে মদীনায় নিয়ে যাচ্ছিলে কোন্ সাহসে?

সিফির বলিলেন, চুরি করে নিয়ে যাইনি তো?

বসো দেখাচ্ছি মজা! এই বলিয়া সম্রাট সিফির ও কাফুরকে দেখাইয়া প্রহরীদের বলিলেন, তোদের সাধ্যমত মনের ঝাল মিটিয়ে এদের শায়েস্তা কর।

অনেক দিন পর মনের মত একটি কাজ পাইয়া প্রহরীরা সিফির ও কাফুরের শরীর বেত্রাঘাতে জর্জরিত করিতে লাগিল। স্বামীকে রক্ষা করিতে যাইয়া জিনিয়াও প্রহরীদের বেত্রাঘাতে জর্জরিত হইতে লাগিলেন।

শাহেরবানু পিতৃসকাশে দাঁড়াইয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, মামা আমাকে চুরি করে নেননি। পেদর তাঁকে ছেড়ে দিন। তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

সম্রাট সক্রোধে জিজ্ঞাসা করিলেন, তা হলে তুমি এদের সাথে যোগাযোগ হলে কেমন করে?

শাহেরবানু কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, আমি যে মামাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম!

গিয়েছিলে তা তো জানি। কিন্তু তুমি তাদের কাফেলায় যোগদান করলে কেন? জান না সে যে ইসলাম গ্রহণ করেছে?

শাহেরবানু অবিচল কণ্ঠে বলিলেন, ঐজন্যই তো তাঁদের সঙ্গে মদীনায় যাওয়ার জন্য রওয়ানা হয়েছিলাম। পেদর আমি যে মহানবীর সঙ্গে সাক্ষাত করতে চেয়েছিলাম। আমি যে ইসলাম গ্রহণ করেছি,!

শাহেরবানুর কথা শুনিয়া সম্রাট বাহ্যিক চৈতন্য ও ধৈর্য হারাইয়া ফেলিলেন। তিনি স্থান-কাল ভুলিয়া শাহেরবানুকে এমন জোরে পদাঘাত করিলেন যে তিনি ভূ-লুণ্ঠিত হইলেন। ভূ-পতিতা শাহেরবানু সম্রাটের লাথিতে লাথিতে গড়াইতে লাগিলেন। পায়ের সাথে সম্রাটের মুখও সমানতালে চলিতে লাগিল। তিনি ক্রোধে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, কুলাঙ্গার মেয়ে আমার বংশের গৌরব ধূলিসাৎ করে দিয়েছে! আমার কুল-মান বিসর্জন দিয়ে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে মদীনায়। যে লোক আমার রাজ্য ও সিংহাসন দখল করার হুমকি দিয়েছে, তারই কাছে আশ্রয় নিতে যাচ্ছে আমারই মেয়ে? এর চেয়ে অপমান আর কী আছে!

ইয়াজদিগার্দের দরবারকক্ষ প্রহারকক্ষে পরিণত হইল। সভাসদবর্গের

অনেকেই এই দৃশ্য সহ্য করতে না পারিয়া কক্ষ ত্যাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

প্রভুভক্ত প্রহরীরা সম্রাটের নির্দেশ পালন করিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, সিফির, কাফুর, জিনিয়া ও শাহেরবানু কাহারো মুখে কোন বেদনার চিহ্ন নাই। আঘাতজনিত আহ্! উহ্!! ধ্বনি নাই। সকলের মুখে কেবল একটি বাণী- লাইলাহা ইল্লাল্লাহ! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ!!

এই অমিয় বাণী ইয়াজদিগার্দের কানে অসহ্য হইল। তিনি শাহেরবানুকে ছাড়িয়া দিয়া সিফিরের কাছে যাইয়া বলিতে লাগিলেন, এ মন্ত্র বন্ধ কর সিফির, বন্ধ কর। কিন্তু কে শোনে কার কথা, বরং কণ্ঠচতুষ্টয় হইতে আরও উচ্চ কণ্ঠে ঘোষিত হইতে লাগিল, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ!!

ইয়াজদিগার্দের মাথায় যেন খুন চড়িয়া গিয়াছে! তিনি হাঁকিলেন, আরও জোরছে লাগাও। জোরছে লাগাও!!

দুইজন প্রহরী শরীরের সর্বশক্তি বেত্রের উপর প্রয়োগ করিয়া বেত্র চালাইতে লাগিল। বেত্রের সাঁৎ সাঁৎ শব্দ এবং প্রহরীদের নাসিকাসৃত হুঁ! হুঁ!! ধ্বনি ছাপাইয়া মুক্তি সেবকদের কণ্ঠ হইতে ততোধিক শব্দে ধ্বনিত হইতে লাগিল, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ!!

সম্রাট কানে আঙ্গুল দিয়া বলিলেন, অসহ্য! অসহ্য!! এ মন্ত্র! এদেরকে নিয়ে যা আমাদের সম্মুখ থেকে। কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে এদের বন্দী করে রাখবে। কারাধ্যক্ষ শেরদিলকে বলবে, এদের কাজ হল – সিফির কারাগারের কুয়া থেকে পানি তুলবে, কাফুর লাকড়ি চিড়বে, জিনিয়া রুটি সেঁকবে এবং শাহেরবানু চাকতিতে আটা পিষবে। এদের কাজের সময় হল উদয়-অস্ত। খাবার বরাদ্দ হল সারাদিনে জনপ্রতি মাত্র দুটি করে রুটি। প্রহরী বন্দীদের লইয়া বাহির হইয়া গেল।

সিফির ও শাহেরবানু সম্বন্ধীয় খবরটি রাজবাড়ীতে ছড়াইয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দিলরাজবানু, পরীবানু, গুলবানু ও পরিবারের অন্যা সবাই সম্রাট সকাশে অনুনয়, বিনয় ও কান্নাকাটি করিয়া শাহেরবানুর মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না, বরং সম্রাট উল্টাভাবে সম্রাজ্ঞী দিলরাজবানুকেই জব্দ করিলেন, শাহেরবানু যে রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আসে নাই তাহা কেন তাহাকে জানানো হইল না কিংবা কেন শাহেরবানুকে রাত্রেই ফিরিয়া আনা হইল না?

দিলরাজবানু আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া বলিলেন, পরিচারিকারা এসে বলল যে, শাহেরবানু কিছুতেই আজ বাড়ীতেই আসতে চাইল না। কিন্তু সে যে এমন কর্ম করবে তা কে জানত!

সম্রাট সক্রোধে বলিলেন, সে যেমন কর্ম করেছে, তেমন ফল ভোগ করবে। ওর জন্য যে সুপারিশ করবে তারও কারাবাসে যেতে হবে।

সুপারিশের পরিণামের কথা শুনিয়া আর কেহই শাহেরবানুর জন্য সুপারিশ করিতে সাহস করিল না।

৪

কারাগারে জেনানা বিভাগ আলাদা থাকিতেও সম্রাট ইচ্ছা করিয়াই শাহেরবানু ও জিনিয়াকে পুরুষ বিভাগের একটি কক্ষে স্থান দিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। পার্শ্ববর্তী কক্ষটিতে স্থান হইল সিফির ও কাফুরের। এমন নির্দেশ দিবার পিছনে সম্রাটের প্রতিহিংসা। তিনি মনে করিয়াছিলেন ইহাতে বন্দীদের প্রতি অপমানসূচক আচরণ করা হইল এবং তাহাদের অপমানের অনুশোচনা আসিবে। কিন্তু এই ব্যবস্থা বন্দীদের জন্য হইল শাপে বর! তাহারা সিফিরের কাছে হাতে কলমে ইসলাম শিক্ষার সুযোগ পাইলেন।

কক্ষ দুইটির ভিতর দিকে ছিল একটি দরজা, তাই গভীর রাত্রে সিফির সবাইকে ডাকিয়া লইয়া এক সাথে বসিয়া দ্বীনী তালিম দিবার সুযোগ পাইলেন। সিফির সকলকে ইসলামের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করিয়া শোনান। ধর্মীয় বিধানগুলি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন। তোতা পাখী পড়ার মত করিয়া শিক্ষা দেন বিভিন্ন দোয়া কালাম। শোনান মহানবীর জীবনের ইতিবৃত্ত, মদীনার কত কাহিনী, শুনান বিভিন্ন যুদ্ধের ইতিহাস। আরও শোনান হযরত বেলাল হযরত আম্মার, হযরত খাব্বাব (রাঃ)-দের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী এবং নির্যাতন ভোগের করুণ গাঁথা। বলেন হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা। বর্ণনা করেন আনছার-মোহাজেরদের অপূর্ব আত্মত্যাগের কথা! এই সব শুনিয়া শুনিয়া তাঁহাদের বিশেষভাবে শাহেরবানুর ঈমানের দৃঢ়তা আরো বাড়িয়া গেল।

একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শাহেরবানুর কোরআন শরীফ পড়িয়া শিখিবার কোন উপায় হইল না। যেহেতু সিফিরের কাছে আল কোরআনের কোন লিখিত অংশবিশেষ ছিল না, তাই সিফিরের কাছে শুনিয়া শুনিয়াই তিনি কোরআন শরীফ মুখস্থ করিতে লাগিলেন এবং অল্প দিনেই সিফিরের জানা অংশগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন। সিফিরও কালামে পাক তেলাওয়াত করিয়া ফারসী ভাষায় তাহা অনুবাদ করিয়া শোনান। শুধু তাহাই নহে শাহেরবানু তৎসঙ্গে আরবী ভাষা শিখিতেও যত্নবান হইলেন। সিফিরও তাঁহাকে আরবী শিখাইতে শুরু করিলেন। রাতের বাকী অংশ তাঁহারা প্রায় এবাদত বন্দেগীতেই কাটাইয়া দিতেন।

কারা প্রাচীরের অন্তরালে বন্দীদের নির্ধারিত কাজগুলি সকলের জন্য মোটামুটি গা-সহা হইয়া উঠিলেও শাহেরবানুর জন্য হইয়া উঠিল খুবই কষ্টকর। যেহেতু জীবনে কোনদিন তিনি কোন কাজই করেন নাই, তদুপরি বয়সে ছিলেন বালিকা।

কাফুর পরিশ্রমী মানুষ। জীবনের প্রথম হতেই কঠিন কাজ,কঠোর পরিশ্রম করিয়া অভ্যস্ত। কাজেই উদয়-অস্ত লাকড়ি চিরা তাহার জন্য তেমন কষ্টকর হইল না।

সারাদিন কুয়া হইতে পানি তুলিতে তুলিতে দড়ির ঘষায় সিফিরের হাতে কহড় পড়িয়া গেলেও সেগুলি এখন শুকাইয়া শক্ত হয়ে গিয়েছে যার ফলে তাঁহার এখন আর তেমন কষ্ট মালুম হয় না।

জিনিয়ার রুটি সেঁকিবার অভ্যাস বরাবরই ছিল, তবে অতিরিক্ত কষ্টের কাজ এইটুকুই যে, সারাটি দিন আগুনের কাছে থাকিতে হয়। এখন ইহাও তাঁহার গাসহা হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু শাহেরবানু? সর্ব কাজে অপটু বালিকা। চাকতি ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাঁহার দুই হাতে ফোসকা পড়িয়া তাহা ফাটিয়া গিয়াছে। তবু চাকতি ঘুরাইতেই হইবে। সম্মুখে বস্তা বোঝাই গম। সন্ধ্যার পূর্বেই ভাঙ্গিয়া শেষ করিবার নির্দেশ। কিন্তু তাঁহার হাত যে আর চলিতে চাহে না! অথচ বসিয়া একটু বিশ্রাম করিবার উপায়ও নাই। প্রহরীরা আসিয়া ধমকায়। কেউ কেউ বা আবার দুই এক ঘা লাগাইয়াও দেয়। শাহজাদী বলিয়া বিন্দুমাত্র সমীহও করে না, বরং শাহজাদীকে মারিতে পারিয়াছে, এই আত্মগৌরব অনুভব করিয়া থাকে। শাহেরবানুর ফোসকা গলা হাতেই আবার তুলিয়া নেন চাকতি ঘুরাইবার কাঠি, এক সময় পিষা শেষ হয় সামনের বস্তা বোঝাই গম। বালিকা ভাবেন বুঝি এইবার একটু বিশ্রাম পাওয়া যাইবে! কিন্তু সে আশা কল্পনামাত্র। আবার সামনে আসে আর এক বস্তা গম। তাহাও পিষিতে হইবে। বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

জিনিয়া কয়েকবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহার সঙ্গে শাহেরবানুর কাজের বদলি করাইবার জন্য, কিন্তু তাহা কোন অবস্থাতেই সম্ভবপর হইয়া উঠিল না। শাহেরবানু যখন কাজ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তখন স্বরচিত কবিতা আবৃতি করেন।

রনজও গম জিন্‌দান্‌রা পরওয়া না কারদাম!

গারতু মদদ্ মানরা দাদী!! চেগমাম!!

হে খোদা! যদি আমার প্রতি তোমার কৃপা বর্ষিত হয়, তবে কারাগারের দুঃখ কষ্টকে আমি পরওয়াই করি না এবং আমার কোন চিন্তাই নাই।

এশ্‌কে তু-ও - এশকে রাছুল ইশরাব!

রোজও শব - দিলে মানরা শুতে আব!!

তোমার ও তোমার রাছুলের ভালবাসার শরাব রাত্রি দিনে আমার হৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন করিতেছে।

এমনিভাবে শাহেরবানু বিভু প্রেমের অনুশীলনী করিতে লাগিলেন যে, কারাগারের কোন কষ্টই তাঁহার গ্রাহ্য হইল না।

মাঝে মাঝেই সম্রাট কারা পরিদর্শনে আসিয়া বন্দীদের কাজের তদারক করিয়া যাইতেন, সব দেখিতেন কিন্তু কোনরূপ সহানুভূতি দেখাইতেন না, বরং মেয়ের কষ্ট দেখিয়া খুশিই হইতেন।

এক রাত্রির ঘটনা। কাফুর ও জিনিয়া নিজ নিজ কক্ষে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। সিফির শাহেরবানুকে মহানবীর জীবন কাহিনী শুনাইতেছেন। এই প্রসঙ্গে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর কথাও আসিয়া পড়িল। তিনি বলিতে লাগিলেন, তোর কষ্ট দেখলে নবী নন্দিনী বিবি ফাতেমার কষ্টের কথাই মনে পড়ে বেটী। তোর যেমন সারাটি দিন কারাগারে গম পিষতে যেয়ে হাতে ফোসকা পড়ে গেছে, তেমনি হযরত ফাতেমা (রাঃ) স্বামীর বাড়ীতে গম পিষতে পিষতে হাতে কহড় পড়ে গেছে। পানির মশক বইতে বইতে বুকে পিঠে দড়ির দাগ পড়ে গেছে। অথচ তিনি ধৈর্য ধারণ করে নিজ কর্তব্য করে যাচ্ছেন। আল্লাহর কুদরত দেখ, বেটী, একজন ছারওয়ারে কায়েনাত খাতামুন নাবেয়ীন ইমামুল মুরছালীন, রাহমাতুল লিল আলামিন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দুহিতা কলিজার টুকরা, বেহেস্তের মেয়েদের সর্দার হযরত ফাতেমা (রাঃ) তাঁরও গম পিষতে হয়। আর একজন প্রবল প্রতাবান্বিত পারশ্য সম্রাট তৃতীয় ইয়াজদিগার্দের কন্যা শাহেরবানু, তাঁরও কারাগারে বসে গম পিষতে হয়। দুজনের কাজের এত সাদৃশ্য! জানি না, এর পিছনে মহান রাব্বুল আলামীনের কি ইংগিত, কি ইশারা লুকিয়ে আছে, তুইও ধৈর্য ধর বেটী, এ ইংগিত হয়ত একদিন মূর্ত হয়ে উঠতে পারে।

শাহেরবানু বলিলেন, মামা, নবী নন্দিনীর কষ্টের কথা শুনে আমার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট লাঘব হয়ে গেছে। তাঁর তুলনায় আমার কষ্ট, কষ্টই নয়। আহা আমি যেয়ে যদি তাঁর কাজের ভার নিতে পারতাম! তাঁর খাদেমা হতে পারতাম! তাদের সাথে একাত্ম হতে পারতাম!

শাহেরবানু আকাশের দিকে তাকাইয়া করজোড়ে মোনাজাতের ভঙ্গিতে কান্না জড়িত কণ্ঠে শেষের কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন।

সিফির উৎকর্ণ হইয়া শাহেরবানুর কথাগুলি শুনিলেন। সন্ধানীর দৃষ্টি দিয়া তিনি শাহেরবানুর হৃদয় মন্দিরের অভ্যন্তর পর্যন্ত দেখিতে পাইলেন। তিনি সবই বুঝিলেন। বলিলেন, আল্লাহ সবই করতে পারেন বেটী, তাঁর কাছে দরখাস্ত কর।

শাহেরবানু বলিলেন, আমার যে অনেক আশা, অনেক আকাঙ্ক্ষা, মামা আমার জন্য দোয়া করুন।

ফি আমানিল্লাহ! আল্লাহ তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। তিনি "ফায়াল্লুল লিমা ইউরীদ"– তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।

সিফির নামাজরত হইলেন। শাহেরবানু স্রষ্টা সমীপে মনের আকুতি জানাইতে প্রার্থনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তাহাঁর দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

৫

এই কঠিন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে সিফির ছিলেন শাহেরবানুর একমাত্র পিতৃতুল্য শ্রদ্ধার জন, আর জিনিয়া ছিলেন মাতৃবৎ ভালবাসার আধার। এই দুই মহাপ্রাণের আশ্রয়ে থাকিয়া শাহেরবানু মাতাপিতার অভাব অনুভব করিতেন না। সারা দিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর রাত্রে তিনি ফিরিয়া পাইতেন দুইটি উদার হৃদয়ের আশ্রয় ছায়া। সিফিরের নিকট হইতে পাইতেন কোরআন ও হাদীসের অমূল্য উপদেশাবলী, আর জিনিয়ার নিকট হইতে পাইতেন মায়ের আদর ও স্নেহ-ভালবাসা। রাত্রে নিদ্রা যাইতেন জিনিয়ার কোলের কাছে। শাহেরবানুর বেদনার ক্ষতে তিনি দিতেন সান্ত্বনার প্রলেপ।

কারাবাসের দুইটি বৎসরে এই রোজনামচা শাহেরবানুর জীবনে একটি ধরা-বাঁধা নিয়মে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। এইভাবেই তাঁহার কারাজীবন কাটিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু অনাগত ভবিষ্যতকে মানুষ যেভাবে পাইবার ও ভোগ করিবার কল্পনা করিয়া থাকে ঠিক সেইভাবে ভবিষ্যৎ আসে না। আসে সম্পূর্ণ কল্পনাতীতভাবে। শাহেরবানুর বেলায়ও তাহাই হইল।

সিফিরের সশ্রম কারাদন্ডের দুইটি বৎসর অতিক্রান্ত হইলেও তাঁহার প্রতি সম্রাট তৃতীয় ইয়াজদিগার্দের প্রতিহিংসার নিবৃত্তি হইল না। তাঁহার পিতার আমলের বিশ্বস্ত সভাসদ তদুপরি নিকটতম আত্মীয় হইয়াও সিফির কেন ইসলাম গ্রহণ করিল, কেন তাঁহার মেয়ে শাহেরবানুকে ইসলামে দীক্ষিত করিল, কেনই বা তাহাকে মদীনায় লইয়া যাইতে চাহিল, এই সমস্ত বেদনা সব সময় সম্রাটকে পীড়ন করিত। তাই সম্রাট সিফিরকে আরও কঠোর শাস্তি দিবার জন্য নতুন এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। তিনি সিফির ও জিনিয়াকে খসরু পারভেজ কর্তৃক নির্মিত কুখ্যাত সুস্তার কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দিলেন। কাফুরের জন্য ব্যবস্থা হইল রাতদিন শৃংখলিত অবস্থায় অত্র কারাগারেই পৃথক একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দী থাকিবে।

বদলি হওয়ার সময় সিফির শাহেরবানুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বেটী! তোর জীবনে যে দুঃখ-দুর্ভোগ নেমে এসেছে এর চেয়েও অনেক বেশী দুর্ভোগ পোহায়েছেন আমাদের পিয়ারে নবী। শে'বে গিরি সংকটে থাকাকালে কত গাছের পাতাও আহার করেছেন, তায়েফে রক্তাক্ত হয়েছে তাঁর নূর বদন! দ্বীনের খাতিরে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন মহানবীর নূরানী পেশানী, শহীদ হয়েছে দান্দান মোবারক। ক্ষুধার তাড়নায় পাথর বেঁধেছেন পেটে। দ্বীন প্রচারে চিরতরে ত্যাগ করেছেন জন্মভূমি। সেসবের তুলনায় তোর আর আমার এ কষ্ট তো কষ্টই নয়! মনে

রাখিস বেটী! জয় আমাদের সুনিশ্চিত। আল্লাহ বলেছেন,

"যখন আল্লাহর বিজয় আসিবে তখন দেখিবে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামে মানুষ দলে দলে প্রবিষ্ট হইতেছে।" সেদিন আর খুব বেশী দূরে নয় বেটী! মনে রাখবে আল্লাহর ওয়াদা মিথ্যে হতে পারে না।

সিফির ও জিনিয়ার বিদায়লগ্নে শাহেরবানু কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, আজ হতে সত্যিকারভাবে আমি মাতাপিতাকে হারালাম। কারাগারে আমি হলাম নিঃস্ব। আজ হতে সত্যি আমার কারাবাস শুরু হল!

যাত্রাকালে সিফির আবার বলিলেন, ভয় নেই মা। আল্লাহ বলেন,

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি উত্তম সাহায্যকারী এবং তিনিই উত্তম আশ্রয়স্থল।"

তুই ধৈর্য ধারণ কর। মাদর আল্লাহ তোকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন।

সিফিরের কথায় শাহেরবানু আশ্বস্ত হইলেন। শৃংখলিত সিফিরকে লইয়া প্রহরিগণ চলিতে লাগিল। শাহেরবানুকে লক্ষ্য করিয়া সিফির বলিলেন, চলি মাদর। আল্লাহ হাফেজ!

অশ্রু নয়নে জিনিয়া বারংবার শাহেরবানুর দিকে তাকাইতেছিলেন। তিনি কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, আমার কোন ছেলেমেয়ে নেই, শাহজাদী তুমিই ছিলে আমার মাতৃহৃদয়ের একমাত্র অধিকারী সন্তান। সমস্ত স্নেহ ভালবাসার মায়া-মমতার মূর্ত প্রতীক। তোমাকে হারিয়ে আজ আমি সর্বহারা নিঃস্ব। আল্লাহ যেন আবার তোমাকে দেখার সুযোগ করে দেন। বিদায়! শাহেরবানু বিদায়!

শাহেরবানু অনিমেষ নেত্রে তাকাইয়া রহিলেন তাঁহাদের গমন পথের দিকে। অলক্ষ্যেই তাঁহার গণ্ড গড়াইয়া ঝরিতে লাগিল অশ্রুধারা। এক সময় যাত্রীদল অদৃশ্য হইয়া গেল কারা ফটকের অন্তরালে। শাহেরবানু ফিরিয়া আসিলেন তাঁহার কাজের ঘরে। চাকতি ঘুরাইবার কাঠি হাতে নিলেন, কিন্তু হাতের কাঠি হাতেই ধরা থাকে, চাকতি ঘুরে না, উদাসীনভাবে বসিয়া থাকেন, প্রহরী আসিয়া ধমক দেয়। আবার চাকতি ঘুরিতে থাকে।

আজ রাত্রে শাহেরবানু তাঁহার কক্ষে একাকিনী। হঠাৎ এই নিঃসঙ্গতা তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। চোখে ঘুম নাই। তদুপরি গভীর এই নির্জনতা ও নিস্তব্ধতা কিছুটা ভয়েরও উদ্রেক করিল। মনের শক্তি সাহস ফিরিয়া পাইবার জন্য তিনি সুর করিয়া কোরান শরীফের সূরায়ে বাকারার চতুত্রিংশ রুকুটি পাঠ করিতে লাগিলেন।

"ইয়া আইয়ু হাল্লাজীনা আমানু আনফিকু মিম্মা রাজাকনাকুম মিস্ কাবলি আইয়াতিয়া য়াওমুন লা বাইয়ুন ফিহে, ওয়ালা খুল্লাতুও, ওয়ালা সাফায়াতুন্ ওয়াল কাফেরুনা হুমুজ্ জোয়ালেমুন"

তাঁহার মিষ্টি সুরের ঝংকারে কারাগারের নিশীথের নির্জনতাকে ভাঙ্গিয়া খান খান করিয়া দিল। সুরের আমেজে কারা প্রাচীরের পাথরগুলি যেন বিগলিত হইতে লাগিল! কোরানের প্রতিটি শব্দ বাতাসে ঢেউ তুলিয়া প্রাচীরের গাত্রে গাত্রে প্রতিধ্বনি হইতেছিল। সেই সুর লহরীর রেশ ধরিয়া একটি সাবধানী পদধ্বনি ধীরে ধীরে শাহেরবানুর কক্ষের সামনে আসিয়া থামিয়া গেল।

লোকটি কারাধ্যক্ষ শেরদিল। তিনি ছিলেন সেমেটিক জাতীয় খৃস্টান। অন্যান্য রাত্রের মত আজ রাত্রেও কারা পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। পরিদর্শন কার্য শেষ করিয়া ফিরিবার পথে শাহেরবানুর কোরআন পাঠ শ্রবণ করিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া থামিয়াছেন তাঁহার কক্ষের দোর গোড়ায়। যতই শুনিতেছেন ততই অভিভূত হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহার মনপ্রাণ যেন শীতল বারি পানে তৃপ্ত হইতেছিল! আহা! একি অর্থবোধক উপদেশ নাকি সাপের মন্ত্র? ইহা কোন কবির রচনা হইতেই পারে না। শেরদিল বুভুক্ষুর মত তন্ময় হইয়া শুনিয়া যাইতে লাগিলেন এই অমিয় বাণী।

এক সময় শাহেরবানু রুকুটি পড়িয়া শেষ করিলেন। বাহিরে শেরদিলের অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল, হায়! কি মধুর সুর লহরী বন্ধ হইয়া গেল! না ফিরিয়া যাওয়া চলে না। ইহার মর্মার্থ উদ্ধার করিতেই হইবে। তিনি রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিতে লাগিলেন, দরজা খুলুন শাহ্জাদী।

শাহেরবানু শংকিত হইয়া বলিলেন, এত রাত্রে কে?

অনুনয় কণ্ঠে শেরদিল বলিলেন, আমি কারাধ্যক্ষ শেরদিল। দয়া করে দরজাটা একটু খুলুন শাহজাদী।

আর কোন প্রশ্ন না করিয়া শাহেরবানু দরজা খুলিয়া দিলেন। শেরদিল কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, আপনি কি পাঠ করছিলেন শাহজাদী। আপনার আবৃত্তির সুর লহরীই আমাকে এখানে টেনে এনেছে। দয়া করে আর একবার পড়ে শোনান।

শাহেরবানু বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া শেরদিলের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। কোন উত্তর করিতে পারিলেন না।

শেরদিল শাহেরবানুর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, আমি কোন দুরভিসন্ধি নিয়ে আসিনি শাহজাদী! বিশ্বাস করুন, আপনার যাদুময়ী সেই পড়ার

সুর শুনেই আমি এখানে এসেছি। আমি যতটুকু শুনতে পেরেছি তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এটা কোন মানুষের রচনা নয়। আমাদের ইঞ্জিল যে জায়গা হতে এসেছে এটাও যে সেখানকার জিনিস। দয়া করে আবার পড়ুন শাহজাদী।

শাহেরবানুর মনে আর কোন সংশয় রহিল না। তিনি আবার রুকুটি পাঠ করিলেন এবং শেরদিলের অনুরোধে ফারসীতে অনুবাদ করিয়া শুনাইলেন। দ্বীনভক্ত পাঠকদের সুবিধার জন্য আমরা তাহার বঙ্গানুবাদ পেশ করিলাম ঃ

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের যে রিজিক দেওয়া হইয়াছে, সেখান হইতে সেই দিন আসিবার পূর্বেই দান খয়রাত কর, খরচ কর, যেদিন কোন ক্রয়-বিক্রয় চলিবে না, কোন বন্ধু-বান্ধব থাকিবে না, যে দিন কোন সুপারিশ চলিবে না। অবিশ্বাসীরা নিশ্চয় অত্যাচারী। (২৫৪) আল্লাহ তিনিই যাঁহাকে ছাড়া অন্য কেউ উপাস্য নাই। তিনি চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব। ঘুম ও তন্দ্রা কোনটাই তাঁহাকে পায় না। জমিনে ও আকাশে যাহা কিছু আছে সবই তাঁহার। এমন কে আছে যে তাঁহার অনুমতি ছাড়া কাহারো সুপারিশ করিতে পারিবে? তাহাদের সামনে পিছনে যাহা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। তাঁহার অন্তর জ্ঞানের কোন বিষয়েই কেহ ধারণা করিতে পারে না। তবে যেইটুকু আল্লাহ ইচ্ছা করেন কেবল সেইটুকুই মানুষ জানিতে পারে। তাঁহার কর্তৃত্ব সমস্ত আসমানে জমিনে বিস্তৃত। এই সবের রক্ষণে তাঁহার কোন প্রকার ক্লান্তি বোধ হয় না। তিনি অতি উচ্চ অতি মহান। (২৫৫) ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তী নাই। কেননা নিশ্চয়ই হেদায়েত এখন ভ্রষ্টতা হইতে সুস্পষ্টভাবে পৃথক হইয়া গিয়াছে। যে শয়তানের শয়তানীকে অস্বীকার করিয়াছে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছে সে এমনি একটি শক্তিশালী অবলম্বন আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে যাহা কখনও ছিঁড়িয়া যাইবে না। বস্তুত আল্লাহ সব কিছু শ্রবণ করেন এবং সব কিছুই জানেন। (২৫৬) আল্লাহই হইতেছেন মোমেনদের একমাত্র অভিভাবক যিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে চালিত করেন। আর যাহারা আল্লাহকে অস্বীকার করিল, শয়তান হইল তাহাদের অভিভাবক। সে তাহাদিগকে আলো হইতে অন্ধকারের দিকে পরিচালিত করে। ইহারাই হইল জাহান্নামের অধিবাসী এবং তাহারা সেখানে চিরদিন থাকিবে। (২৫৭)

শাহেরবানুর অর্থ বলা শেষ হইলে শেরদিল সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, এবার আমি নিঃসন্দেহ হলাম শাহজাদী, ইহা ঐশী বাণী ছাড়া আর কিছুই নহে।

শাহেরবানু বলিলেন, তা যদি বুঝে থাকেন তবে আপনার ইসলাম গ্রহণ করা উচিৎ। আমি আপনাকে ইসলাম গ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ মহান আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কৃত করবেন।

শেরদিল তখন সত্যাগ্রহী হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, আমাকে দ্বীন শিক্ষা দিন শাহজাদী।

শাহেরবানু তৎক্ষণাৎ শেরদিলকে অজু করাইয়া আনিলেন এবং কলেমায়ে তৈয়ব ও কলেমায়ে শাহাদৎ পাঠ করাইয়া ইসলামে দীক্ষিত করিলেন।

শেরদিল বলিলেন, আপনি আমার আলোর দিশারী পথপ্রদর্শক 'মাদর'। আপনার জন্য জান কোরবান করতেও প্রস্তুত। বলুন এখন আপনার জন্য কি করতে হবে এবং আমার কি কাজ! মাদর।

বলা বাহুল্য, এখন হইতে শেরদিল শাহেরবানুকে মাদর বলিয়া ডাকিতেন।

শাহেরবানু বলিলেন, আপনি শুধু ইসলামে দীক্ষা নিলেন, কিন্তু শিক্ষা এখনও অনেক বাকী আছে। আপনি অবসরমত এসে দ্বীন শিক্ষা করতে থাকবেন এবং দ্বীন প্রচারে সচেষ্ট হবেন। এটাই আপনার কাজ। আমার জন্য কিছু করতে হবে না। তবে কিছু করার মত হলে বলব।

শেরদিল নিজ আবাসে ফিরিয়া চলিলেন। তাঁহার কাছে দুনিয়াটা এখন সম্পূর্ণ নতুন মনে হইতে লাগিল। তাঁহার মনপ্রাণ যেন আলোময় হইয়া উঠিয়াছে! মনে খেলিয়া যাইতেছে আনন্দের ঢেউ। পূতিগন্ধময় তিনি যেন এইমাত্র সুগন্ধিময় এক স্নিগ্ধ সলিলা সরোবর হইতে গোসল করিয়া উঠিয়াছেন। তিনি আজ ধন্য। ভিক্ষুক পাইয়াছে রত্নাগারের সন্ধান!

ইহার পর হইতে শেরদিল নিয়মিতভাবে গভীর রাত্রে শাহেরবানুর কাছে আসিয়া দ্বীন শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং কিভাবে দ্বীন প্রচার করা যায় তাহা আলোচনা করেন। আলোচনার ফলশ্রুতিতে শাহেরবানু বলিলেন, কারাগারের বাইরে কোন অবস্থাতেই প্রচার কার্য চালানো এখন সম্ভব নয়। কাজেই কারা কর্মচারী ও বন্দীদের মাঝেই প্রচার কার্য চালাতে হবে। বলা বাহুল্য এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হইল।

দীর্ঘ দিন কারাগারে থাকাতে বন্দীদের মাঝে শাহেরবানুর বেশ কিছুটা ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হইয়াছিল। তদুপরি শাহেরবানুর অমায়িক ব্যবহারে বন্দীরা ছিল তাঁহার গুণমুগ্ধ। কিন্তু তাঁহার ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে কারাদণ্ড হইয়াছে ইহা খুব কম লোকেই জানিত। সবাই জানিত বিশেষ কারণে পিতার কোপানলে পড়িয়াই শাহেরবানু কারাগারে আসিয়াছে। তবে শাহজাদী বলিয়া তিনি ছিলেন সকলের সমীহের পাত্র। শ্রদ্ধার পাত্র।

শাহেরবানু যেন কাজের মত একটি কাজ পাইয়া গেলেন! তাঁহার কাছে এক নূতন দিগন্তের দ্বার খুলিয়া গেল। তাঁহার প্রতি বন্দীদের শ্রদ্ধার ভাবকে তিনি কাজে লাগাইলেন। তিনি বন্দীদের মাঝে ইসলাম প্রচার শুরু করিলেন। ফলত অল্প দিনের মধ্যেই বন্দীদের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইল।

কারাগারের অধিকাংশ কর্মচারীই ছিল সেমেটিক জাতীয় খৃস্টান এবং শেরদিলের অনুরক্ত ভক্ত। তাঁহার অক্লান্ত ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় ইহাদের প্রায়

সকলেই শেরদিলের পদাংক অনুসরণ করিয়া ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইহাদের ইসলাম গ্রহণের কথা সম্রাটের কর্ণগোচর হইলে নানা প্রকার নূতন লাঞ্ছনার আশংকা আছে। এই মনে করিয়াই শাহেরবানু সকলকেই নিজ নিজ ধর্মান্তর গ্রহণের কথা আপাতত গোপন রাখিতে নির্দেশ দিলেন। সকলেই তাঁহার নির্দেশ মানিয়া লইল। যে-ই ইসলাম গ্রহণ করিত, একমাত্র সেই জানিত ব্যাপার কি হইতেছে।

অতিরিক্ত সাবধানতার জন্য শাহেরবানুর পরামর্শে শেরদিলও এমন কৌশলে কর্মচারী ও বন্দীদের মধ্যে কর্মসূচী ভাগ করিয়া দিলেন যে, দিনের প্রথম ভাগে সমস্ত অমুসলিম কর্মচারী ও বন্দীদের কাজের পালা, দিনের শেষভাগে কেবল মুসলমান কর্মচারী ও বন্দীদের কাজের পালা।

এই ব্যবস্থার ফলে কারাগারের ভিতরে একটি আমূল পরিবর্তন আসিল। মুসলমান কর্মচারী ও মুসলমান বন্দীদের একটি ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধ ও সৌহার্দ্য স্থাপিত হইল। শাহেরবানুর প্রচেষ্টায় প্রশাসক কারাকর্মচারী ও শাসিত বন্দীদের প্রভু-গোলাম প্রভেদ উঠিয়া গিয়া সেখানে মুসলিম ঐক্য স্থাপিত হইল। কারাধ্যক্ষ শেরদিল এই সুযোগ পুরাপুরি কাজে লাগাইলেন। তিনি শাহেরবানুর চাকতি ঘুরাইবার কাজটি অন্যান্য বন্দী মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। বন্দীরাও স্বতঃস্ফুর্তভাবে তাহাদের পথের দিশারী ধর্মীয় পথপ্রদর্শক শাহেরবানুকে শ্রমমুক্ত করিতে আগাইয়া আসিল। ফলে তিনি গম পিষা হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইলেন। সাপ্তাহিক কারগুজারীতে শেরদিল সম্রাটকে জানাইতে লাগিলেন যে, শাহজাদী তাঁহার কাজ নিয়মিতভাবেই করিতেছেন। শুধু যেদিন সম্রাট নিজে কারা পরিদর্শনে আসিবার কথা জানান, কেবল সেইদিন নির্ধারিত সময়ের জন্য শাহেরবানুকে কাজে বসাইয়া দেওয়া হয়। শাহজাদীর অনুগত মুসলমান কারা কর্মচারীদের সদা সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া কারাগারের প্রকৃত খবর কারা ফটক পার হইয়া সম্রাটের কর্ণগোচর হইবার কোন উপায় রহিল না।

কারাগার যে এখন একটি ইসলামী তীর্থ মেলায় এবং শাহেরবানুর অনুগত সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়াছে তাহা সম্রাট বা অমুসলিম কর্মচারী ও বন্দীরা জানিতেই পারিল না।

শাহেরবানুর যে শুধু শ্রমের লাঘব হইল তাহাই নহে, অন্যান্য সুবিধাও হইল। শেরদিল তাঁহার জন্য উন্নত মানের বিছানাপত্র এবং উন্নত মানের খাবার বরাদ্দও বাড়াইয়া দিলেন। সন্ধ্যার পর হইতে বেশ খানিকটা রাত পর্যন্ত তিনজন করিয়া মুসলমান শাহেরবানুর কক্ষে আসিয়া যাহাতে বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষা ও কোরানের তালিম নিতে পারে শেরদিল সেই রকম ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শাহেরবানুর নির্দেশেই জামাতে নামাজ না পড়িয়া সকলেই অনুচ্চ রবে নিজ নিজ নামাজ কক্ষে আদায় করিত। কারণ জামাত করিয়া নামাজ আদায় করিলে তাহা সহজেই সম্রাটের কর্ণগোচর হওয়ার আশংকা আছে। তাই এই ব্যবস্থা।

৬

মানবদেহ ধারণ করিয়া মানবীয় প্রয়োজন কামনা, বাসনা ও প্রবৃত্তিকে কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কাজেই এই সব নিয়া ভাবে, চিন্তা করে, মানুষ আশা করিয়া কল্পনার জাল বোনে। মাকড়সার জালের মতই তাহা ভাঙ্গিয়া যায়, আবার বুনে, আবার আশা করে। কারণ আশাই যে সংসার! আশাই যে মানুষের বাঁচার প্রেরণা যোগায়। শাহেরবানুর বেলাতেও তাহাই হইল। নও-মুসলিমদের তালিম, নামাজ, কোরান পাঠ এবং তপ-জপেই তাহার অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়। অবসর সময়টুকু তিনি শুধু ভাবেন।

ভাবেন তাঁহার নিজের কথা। আজ পর্যন্ত দীর্ঘদিনের কারাবাসের দিনগুলি তাহার কাছে যতনা যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিয়াছে, তাহার চেয়েও বেশী যন্ত্রণাময় হইয়া উঠিয়াছে মহানবীকে দেখিতে না পারার বেদনা। তিনি তাঁহাকে দেখিতে পারিবেন না? আল্লাহ কি তাঁহার আশা পূরণ করিবেন না? মহানবী তাঁহার পরিবারবর্গ হযরত মা ফাতেমা (রাঃ), হযরত হাসান (রাঃ), হযরত হোসাইন (রাঃ) সবাই যেন তাঁহার মানসপটে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছেন! সিফিরের মুখে ইঁহাদের কত কাহিনীই না তিনি শুনিয়াছেন! এত বেশী বার শুনিয়াছেন যে, প্রতিটি কাহিনীই তাঁহার কাছে জীবন্ত হইয়া আছে। বিশেষ করিয়া মহানবী ও হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর কে বেশী শ্রেষ্ঠ" এই কাহিনীটিই তাঁহার কাছে বেশী আকর্ষণীয় হইয়া রহিয়াছে।

তাঁহার মনে প্রশ্ন জাগে, কৌতূহল জাগে। আকর্ষণীয় কোন্‌টি? কাহিনীটি নাকি কাহিনীর বিজয়ী ব্যক্তিটি। মনমুকুরে ভাসিয়া উঠে বিজয়ীর একটি কল্পিত সুন্দর মুখ! হযরত হোসাইন (রাঃ)। লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠে শাহেরবানুর কপোলদ্বয়। ছিঃ! কি শরম! একি ভাবিতেছি আমি? না, আমি আর এই সব ভাবিব না। কিন্তু না! যতই তিনি না ভাবিতে চাহেন, ততই না দেখা একটি কায়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়ায়। লজ্জায় যেন তিনি চোখ তুলিয়া চাহিয়াও দেখিতে পারেন না সামনে আসিয়া দাঁড়ানো কল্পিত কায়াটি। কারাগারের এই নির্জন কক্ষে লজ্জা করিবার মত কেউ বা কিছু না থাকিলেও অহেতুক একটি পুলক শিহরণ আসিয়া তাঁহাকে আরক্তিম লজ্জিত করিয়া তুলে। এই লজ্জাটি তাঁহার কাছে বড় মধুর বলিয়া মনে হয়।

একবার ভাবেন, কোথায় সেই আকাশের মাহতাব আর কোথায় বনের জগ্‌নু-জোনাকী। কোথায় মদীনা মুনাওয়ারা আর কোথায় মাদায়েনের কারাগারের এই নির্জন প্রকোষ্ঠ! কোথায় মহানবীর প্রিয় দৌহিত্র, নবী নন্দিনী মা

ফাতেমা (রাঃ)-র নয়নের নিধি সর্দারে জান্নাত হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) আর কোথায় অগ্নি-উপাসক কাফের তৃতীয় ইয়াজদিগার্দের মেয়ে এই ক্ষুদ্র শাহেরবানু! নিরাশার কালো মেঘ আসিয়া তাঁহার সমস্ত কল্পনাকে ঢাকিয়া ফেলে। বেদনার কালবৈশাখী আসিয়া সমস্ত আশার ফানুসকে এক অজানা দিগন্তের পাড়ে উড়াইয়া লইয়া যায়। পরক্ষণেই অক্ষমতা ও ব্যর্থতার সাইমুমে অসহায় শাহেরবানুর দিল দরিয়ায় প্রলয়ংকরী ঢেউ তুলিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র বক্ষতটকে আঘাতে আঘাতে ভাঙ্গিতে থাকে। কল্পনার রঙ্গিন তাসের ঘর খেলাঘরের মতই ধূলিসাৎ করিয়া দেয়। আসে ফরিয়াদ।

আয় খোদা

দর জাহানে, দিগরেতু, দোস্তে মান!

নিস্ত - যাঁকে, নজদে গুয়াম, দরদে মান!!

হে খোদা, তোমাকে ছাড়া এই পৃথিবীতে আমার কোন বন্ধু নেই। তাই তোমার কাছেই আমার বেদনার কথা বলি।

উম্মেদে মান, পুরাকুন আয়, কেরদেগার!

তুদানীচে, খাহেশাম পর ওয়ারদিগার!!

হে প্রতিপালক, আমার আশাকে পূর্ণ কর। আমার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার কথা কি তুমি জান না?

গারতু খাহী, চশ্‌মেগরী, ব্যাঁরাপুর!

কারদাবুদী, কুল শেকায়েত, ইঁ নাজুর!!

তুমি ইচ্ছা করিলে এই অক্ষমা দরিদ্রার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করিতে পার।

শাহেরবানুর ভাবনার শেষ নাই। তিনি ভাবেন, আমাকে তো আর মহানবী চিনেন না, মা ফাতেমাও চিনেন না; আর চিনেন না - হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)। তাহা হইলে কেমন করিয়া আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হইতে পারে? কেমনে ঘটিবে মনোবেদনার পরিসমাপ্তি? সেই পথে অগ্রসর হইবার পূর্বশর্ত হইল প্রথমে আমাকে তাঁহাদের সাথে পরিচিত হইতে হইবে। কিন্তু তাহার উপায় কি? এই নিয়া কয়েকদিন চিন্তা-ভাবনা করিয়া তিনি নিজেই একটি উপায় স্থির করিলেন। যদি শেরদিল তাঁহাকে সাহায্য করেন তবে একটা উপায় করা যায়।

এই মানসে তিনি একদিন শেরদিলকে বলিলেন, আমার বড়ই আশা ছিল যে, মহানবীকে একবার স্বচক্ষে দেখব। এই আশা নিয়েই মামার সাথে মদীনার পথে পথে পাড়ি জমিয়েছিলাম। কিন্তু বাবার চরদের হাতে ধরা পড়ে বন্দী হলাম এ কঠিন কারাগারে। মহানবীকে দেখার সৌভাগ্য এ জীবনে আর হবে কিনা

জানি না। তবে মনের একান্ত ইচ্ছা, তাঁর কাছে আমার সালাম পাঠাই এবং দোয়া চেয়ে নিই। যদি আপনি কিছু সাহায্য করতে পারেন তবেই আমার এ আশা পূর্ণ হতে পারে।

শেরদিল বলিলেন, বলুন মাদর, কি সাহায্য আপনি চান। আমি আপনাকে সাহায্য করতে আপ্রাণ চেষ্টা করব এবং কোন উপকার করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

শাহেরবানু আশান্বিত হইয়া বলিলেন, কাফুরকে সাময়িকভাবে মুক্তি দেয়া যায় কিনা ভেবে দেখুন। আমি তাকে মহানবীর কাছে আমার সালাম দিয়ে পাঠাতে চাই এবং দোয়া প্রার্থী হতে চাই।

শাহেরবানুর কথায় শেরদিল একটু ভাবিয়া বলিলেন, যেহেতু আমি কারাধ্যক্ষ সেহেতু সে ক্ষমতা আমার আছে, কিন্তু ব্যাপারটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। সম্রাট জানতে পারলে আমার চাকরী ও প্রাণ দুটুই যাবে। তদুপরি ভয় আছে। সে যদি আর ফিরে না আসে!

শাহেরবানু বলিলেন, সে আমি দেখব।

শেরদিল বলিলেন, সম্রাট প্রতি মাসে একবার কারা পরিদর্শনে আসেন, বিশেষভাবে আপনার কাজকর্মের খোঁজ খবর নেন। তা না হলে আপনাকেও আমি সাময়িকভাবে মুক্তি দিতে পারতাম। যাক গতকল্য সম্রাট কারা পরিদর্শন করে গেছেন এবং আজকেই তিনি মুসলমানদের সঙ্গে সীমান্তে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য রাজধানীর বাইরে চলে গেছেন। বলে গেছেন ফিরে আসতে মাসেকের বেশী বিলম্ব হতে পারে। কাজেই মাসেক দিনের জন্য কাফুর মুক্ত। সে আজ গভীর নিশীথের অন্ধকারে আপনার কাছে আসবে। তার যাবার ব্যবস্থা আমি করে রাখব। তবে আমার একটি আরজি আছে মাদর। এই বলিয়া শেরদিল করজোড় হইলেন।

শাহেরবানু জিজ্ঞাসা করিলেন, বলুন আপনার আরজি কি কারাধ্যক্ষ?

শেরদিল ভাবাবেগে গদ গদ কণ্ঠে বলিলেন, মহানবীর চরণ মোবরকে এ অধমের সালামও পৌছে দেবার অনুরোধ করছি মাদর। শেরদিলের চোখ ছল ছল করিতে লাগিল।

শাহেরবানু শেরদিলকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, আপনি আশ্বস্ত হোন কারাধ্যক্ষ আপনার সালাম আমি পৌছাব।

আল্লাহর শুকুরিয়া আদায় করিতে করিতে শেরদিল চলিয়া গেলেন এবং তাঁহার কথা রক্ষা করিলেন। গভীর রাত্রে কাফুর শাহেরবানুর দরজায় আসিয়া ডাকিল, শাহজাদী!

শাহেরবানু উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন।

আবার শব্দ হইল, শাহজাদী! আমি কাফুর।

শাহেরবানু দরজা খুলিয়া দিয়া বলিলেন, ভিতরে এসো। কথা আছে। কাফুর কক্ষে প্রবেশ করিল। প্রদীপের স্বল্পালোকে শাহেরবানু লক্ষ্য করিলেন, কাফুরের হাতে পায়ে কিসের যেন দাগ! তিনি চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, তোমার হাতে পায়ে ওসব কিসের দাগ কাফুর?

কাফুর বলিতে লাগিল, রাত-দিন আমার পায়ে কন্টকিত বিষাক্ত শৃংখল পরিয়ে রাখা হত। এ তারই দাগ। কারাধ্যক্ষ ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি চেয়েছিলেন আমার এ কঠিন শাস্তি লাঘব করতে। কিন্তু আমার কক্ষপ্রহরীর জন্য তা সম্ভব হয়ে উঠছিল না। তাই তিনি লাগলেন প্রহরীর পিছনে। তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টার ফলে প্রহরীটি ইসলাম গ্রহণ করে। প্রহরী আমাদের দ্বীনী ভাই। এরপর হতেই কারাধ্যক্ষ আমার জন্য সে ব্যবস্থা রহিত করে দেন। দিন রাত শৃংখল মুক্তই থাকি। শুধু সম্রাট কারা পরিদর্শনে আসার দিন কিছু সময়ের জন্য আল্‌তোভাবে শৃংখল পরিয়ে রাখা হয়।

হাত দুইটি আলোর সামনে মেলিয়া ধরিয়া দাগগুলি শাহেরবানুকে দেখাইল, নিজেও দেখিল। শাহেরবানু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন দাগগুলি শুকাইয়া গেলেও কব্জির উপরে ধবল রোগীর মত সাদা হইয়া রহিয়াছে।

কাফুর বলিল, ঘা আর নেই, শুকিয়ে গেছে। তাও কিন্তু হল আপনার বদৌলতেই, আম্মি!

শাহেরবানু বলিলেন, আমার বদৌলতে নয়, বল আল্লাহর মেহেরবানীতে।

কিন্তু আমার মুক্তিটা! কাফুরের চোখে মুখে আনন্দ যেন নাচিয়া উঠিল!

এটাও আল্লাহর ইচ্ছা। কিন্তু তোমার মুক্তিটা সাময়িক।

সাময়িক কেমন? আম্মি?

তোমাকে আবার কারাগারে ফিরে আসতে হবে।

অবশ্যই ফিরে আসব। আপনার কথার অবাধ্য কোনদিনও হব না আম্মি! মনে রাখবেন কাফুর বেঁচে থাকতে আপনার নফরের অভাব কোনদিন হবে না।

তোমাকে কেন মুক্তি দেয়া হল সে সম্বন্ধে কারাধ্যক্ষ কিছু বলেছে কি?

না আম্মি! কারাধ্যক্ষ শুধু বললেন, মাদরের কথায় তুমি এখন থেকে কারামুক্ত। তিনি যা বলবেন তা করতে হবে। এক প্রহর রাত থাকতে এসো, কারা ফটক খুলে দেব।

শাহেরবানু ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, তুমি সোজা মদীনায় চলে যাবে। মদীনার মসজিদ সংলগ্ন মহানবীর নিবাসস্থল। তাঁর সঙ্গে দেখা করে আদবের

সাথে সালাম দেবে। খবরদার! কোনরূপ বেয়াদবী যেন না হয়! কুশলাদি জানার পর যখন তোমাকে জিজ্ঞেস করবেন তুমি কোথেকে কি জন্যে গিয়েছ, তখন আস্তে আস্তে বিস্তারিতভাবে বলবে আমার পরিচয়, আমার দুর্ভাগ্যের কারণ এবং আমার বর্তমান অবস্থা। আরও বলবে তুমি ও শেরদিলসহ কারাগারের সকল মুসলমানের পূর্ণ বিবরণ। বলবে সিফির মামা ও জিনিয়া মামানীর কথা। তারপর জানাবে আমার ও আমাদের সকলের সালাম। বলবে আমাদের জন্য যেন তিনি দোয়া করেন! মা ফাতেমাকেও আমার সালাম পৌছাবে।

শাহেরবানু একটু দম নিয়া আবার বলিলেন, সর্বশেষ বলবে আমি তাঁকে দেখতে চাই, দেখতে চাই হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে। একটু ইতস্তত করিয়া শাহেরবানু টানিয়া টানিয়া বলিলেন, আর দেখতে চাই তাঁর আদরের নাতি হযরত হোসাইনকে। বাক্যটি উচ্চারণ করিবার সময় তাঁহার চেহারা শরম লাজে রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কাফুর সবই লক্ষ্য করিল, কিন্তু কোন কারণ বুঝিল না।

শাহেরবানু আবার বলিলেন, সব কিছু শুনে মহানবী কি বলেন সে খবর নিয়ে মাসকালের মধ্যেই তোমাকে ফিরে আসতে হবে। যাও! পথের কষ্টটুকু আমার জন্য স্বীকার করে নিও কাফুর।

কাফুর করজোড়ে বলিল, আপনার কৃপায় আজ আমি সাময়িকভাবে হলেও মুক্ত। আপানার দয়ায় দেখতে যাচ্ছি সোনার মদীনায় প্রাণের নবীকে। এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আমার জন্য আর কী হতে পারে আম্মি! পথের কষ্ট আমার জন্য কিছুই নয়। যাই আম্মি! আমার জন্য দোয়া করবেন। শাহেরবানু হাত তুলিলেন। ফি আমানিল্লাহ! আল্লা হাফিজ!

কাফুর শাহেরবানুর কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। শেরদিলের প্রচেষ্টায় কারাগারের ফটকরক্ষী পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। কাফুর কারা ফটকে পৌছিতেই ফটকরক্ষী দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিল, ভাই কাফুর, তুমিই ভাগ্যবান ব্যক্তি। নবী দর্শনে চলেছ। যাও। মহানবীর কাছে আমার সলাম পৌছে দিও। ঐ দেখ গাছের ছায়ায় তোমার অশ্ব ও সফরের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত। দেরী করো না। বেরিয়ে পড়।

“বিছমিল্লাহে মাজরেহা ওয়া মুরছাহা ইন্না রাব্বি লা গাফুরুর রাহীম” বলিয়া কাফুর অশ্বে আরোহণ করিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। পরদিন প্রচার হইল যে, কয়েকদিনের জন্য কাফুরকে অন্য কারাগারে বদলি করা হইয়াছে।

সম্রাটের সেনাবাহিনীর সেমিটিক জাতীয় একজন পদস্থ কর্মচারী শমশিরের সঙ্গে শেরদিলের ছিল খুবই দহরম-মহরম ভাব। তাঁহার সহায়তায় শেরদিল কাফুরের জন্য সেনাবাহিনীর একটি ভাল অশ্বের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

৭

কাফুর রাতারাতি ফুরাত নদী পার হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে পূর্বাকাশ রঙ্গিন হইয়া উঠিল। জেরুজালেমগামী একটি সওদাগরি কাফেলার সাথে সহগামী হইয়া কাফুর নির্বিঘ্নে মদীনার পথে অগ্রসর হইল।

শাহেরবানু মনে মনে নানা প্রকার কল্পনার জাল বুনিয়া যাইতেছেন। তাঁহার জিজ্ঞাসার কি উত্তর আসিবে, মহানবী তাহাদের মুক্তির কোন উপায় করিবেন কিনা, কবে তিনি মদীনায় যাইতে পারিবেন, কবে তাঁহার আশা পূর্ণ হইবে, নাকি আদৌ পূর্ণ হইবে না। এমন সব তাঁহার কল্পনা। রাত দিনের প্রতিটি মুহূর্ত শাহেরবানু উৎকর্ণ হইয়া থাকেন। কখন কাফুর আসিয়া ডাক দেয়!

কাফুর মদীনা যাওয়ার তখনও এক মাস পূর্ণ হয় নাই, একদা রাত্রে শাহেরবানু নামাজান্তে অজিফা পাঠে রত আছেন, এমন সময় দরজায় মৃদু করাঘাত হইল।

আবার! আবার!!

শাহেরবানুর ধ্যানস্থ তন্দ্রালু তনু চকিত হইয়া উঠিল। তিনি ডাকিলেন, কে?

উত্তর আসিল, আমি কাফুর।

গভীর রাত্রে কাফুর মদীনা হইতে আসিয়া শেরদিলের সঙ্গে তাঁহার আবাসে দেখা করিল। তিনি তাঁহাকে পূর্ব নিয়মে কারাগারে প্রবেশ করাইয়া দিলেন।

কাফুরের কণ্ঠস্বর শুনিয়াই শাহেরবানুর বুকের ভিতর তুমুল আন্দোলন শুরু হইল। বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। কম্পিত হস্তে তিনি দরজা খুলিয়া দিলেন। ধীর পদক্ষেপে কাফুর কক্ষে প্রবেশ করিয়া নীচের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন কথা বলিল না।

শাহেরবানু সস্নেহ বলি.লেন, নিশ্চয়ই তুমি আমার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছ। সেজন্য তোমাকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। তোমার কুশল সংবাদ বল। কাফুর দৃষ্টি নীচের দিকে রাখিয়াই বলিল, আল্লাহর মেহেরবানী আমার কোন কষ্টই হয়নি। তবে আপনার জন্য কোন শুভ সংবাদ আনতে পারিনি আম্মি।

শাহেরবানুর বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। তিনি উৎকণ্ঠার সহিত প্রশ্ন করিলেন, কেমন?

কাফুর বিনীতভাবে বলিল, বলতে বুক ফেটে যাচ্ছে আম্মি! সব খবর শুনলে আপনি দুঃখ পাবেন, তাই বলতে সাহস পাচ্ছি না।

শাহেরবানুর উৎকণ্ঠা আরও বাড়িয়া গেল। তিনি কতকটা যেন সংযত হইয়া বলিলেন, তবু তো আমার শুনতে হবে। তুমি বল। যত দুঃসংবাদই হোক আমি ধৈর্য ধরব।

কাফুর কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, মদীনা মুনাওয়ারার দিনমণি অস্ত গেছে আজ প্রায় দুই বৎসর পূর্বে।

কি বললে কাফুর? শাহেরবানুর মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল!

কাফুর এবার মুখ তুলিয়া বলিল, প্রায় দুই বৎসর পূর্বে মহানবী আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।

শাহেরবানু এতক্ষণ দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিলেন। কাফুরের শেষ কথা শুনিয়া তাঁহার কি হইল? তিনি টাল খাইয়া পড়িয়া যাইতেছেন দেখিয়া কাফুর চট করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। শাহেরবানু সংজ্ঞা হারাইলেন।

কাফুর কিংকর্তব্যবিমূঢ়! এখন সে কি করিবে, কাহাকে ডাকিয়া আনিবে, এত রাত্রে কাহাকেই বা পাওয়া যাইবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। অগত্যা সে বুদ্ধি খরচ করিয়া শাহেরবানুর চোখে মুখে পানির ঝাপটা দিতে লাগিল এবং পাখার বাতাস করিতে লাগিল। কাফুর ডাকিল, আম্মি! আম্মি! কাফুর ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

শাহেরবানু ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। মনে হইল কে যেন এক ফুৎকারে প্রদীপটি নির্বাপিত করিয়া দিয়াছে! চোখে নামিয়া আসিয়াছে অমানিশার সাগর তলার অন্ধকারের কালিমা। বুকের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এক সঙ্গে হাজার পর্বত। দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে বক্ষব্যাপী নমরূদের অগ্নিকুন্ড। বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাঁহার সমস্ত বাহ্যিক চেতনাশক্তি। অধির শোকে তিনি যেন পাথরবৎ!

এইভাবে তাঁহার কতক্ষণ কাটিয়া গেল সেই খেয়াল তাঁহার নাই। এক সময় কাফুর আস্তে ডাকিল, আম্মি! আবার ডাকিল, আম্মি!!

যেন এইমাত্র ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলেন, এমনিভাবে রক্তাক্ত চক্ষু দুইটি কাফুরের দিকে তুলিয়া শাহেরবানু প্রশ্ন করিলেন, তাঁর রওজা মোবারক তুমি দেখেছ?

কাফুর ধীরে ধীরে বলিল, জী হাঁ। মদীনার মসজিদেই তাঁর রওজা মোবারক দেখে এলাম। শত শত লোক দৈনিক সেখানে রওজা শরীফ জিয়ারত করতে আসেন এবং সালাম জানান। আমিও তাঁর রওজা শরীফ জিয়ারত করেছি এবং আপনার ও আমাদের সকলের সালাম জানিয়েছি।

হযরত মা ফাতেমার কাছে আমার সালাম পৌছিয়েছ?

কাফুর বলিল, মহানবীর তিরোধানের মাত্র ছ'মাস পরেই তিনিও দুনিয়ার

মায়া কাটিয়ে পরপারে চলে গেছেন।

এইবার যেন শাহেরবানু স্থান-কাল ভুলিয়া গেলেন! তিনি উদাসিনীর মত প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। হায় আল্লাহ! তুমি, তুমি না মুজিবুদ দাওয়াত! রাহমানুর রাহীম। তুমি না দয়ার সাগর! তুমি না মজলুমের ফরিয়াদ শুনে থাক? গরীবের ডাকে সাড়া দাও? কিন্তু একি করলে খোদা? যাঁদেরকে দেখার জন্য দীর্ঘ চারচারটি বৎসর কারাগারের সমস্ত যাতনা হাসিমুখে সহ্য করে আসছি, আমার চোখ শীতল না করেই তাঁদের উঠিয়ে নিলে? এটাই কি তোমার দয়া? মজলুমের প্রতি করুণা? এ তোমার কেমন লীলাখেলা? এমনিভাবে কেন তুমি আমার মত অসহায়কে বঞ্চিত করলে? চোখের পানিতে শাহেরবানুর বসন সিক্ত হইতে লাগিল। তিনি যেন কিছুতেই আর নিজেকে ফিরিয়া পাইতেছেন না! কাফুর কি উঠিয়া যাইবে নাকি বসিয়া থাকিবে তাহা বুঝিতে না পারিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি এখন যাব আম্মি!

কাফুরের কথার শব্দে শাহেরবানু সম্বিত ফিরিয়া পাইয়া বলিলেন, তুমি কিছু বলছিলে কি?

কাফুর বলিল, জী আম্মি! আমি কি এখন যাব?

কাফুরের কথার কোন উত্তর না দিয়া শাহেরবানু প্রশ্ন করিলেন, মহানবী ইনতিকাল করেছেন। হযরত মা ফাতেমা (রাঃ) আর ইহজগতে নেই। এর পরেও কি মদীনার মানুষ হাসে? কথা বলে? ঘুমায়? নাওয়া-খাওয়া করে? তাঁহার কথায় ক্ষোভ ঝরিয়া পড়িল।

কাফুর ধীরে ধীরে বলিল, তাঁদের ইনতিকালে মদীনায় যে শোকের ঝড় বয়ে গিয়েছিল ক্রমে ক্রমে তা প্রশমিত হয়ে আসছে। মানুষ আবার দৈনন্দিন কাজে আত্মনিয়োগ করেছে, ক্রমেই জীবন যাত্রা সহজ হয়ে আসছে।

শাহেরবানু প্রশ্ন করিলেন, এখন মদীনার তথা ইসলামীয়া সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা কে?

কাফুর বলির, হযরত আবুবকর (রাঃ) এখন ইসলামের খলিফা নির্বাচিত হয়েছেন।

শাহেরবানু আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, তুমি এখন যাও কাফুর।

কাফুর বাহির হইয়া গেলে তিনি আবার কাঁদিতে লাগিলেন। কান্না ছাড়া তাঁহার আর কিই বা করিবার আছে! ফরিয়াদের সুরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তিনি বলিতে লাগিলেনঃ

আয় খোদামান, জিন্দা বুদাম,
দর জিন্দানে, ইঁ বুদাম!
তু চেরামান, রানাদিদি,
নুর বদনরা, না দিদাম!!

হে খোদা. আমি এই কারাগারেই ছিলাম এবং জীবিত ছিলাম। তবু তুমি কেন আমাকে নূর নবীকে দেখাইলে না? কেন আমি তাঁহাকে দেখিতে পারিলাম না?

তিনি যতই কান্না রোধ করিতে চাহেন ততই তাহা শত গুণ হইয়া উথলাইয়া উঠে। অভিমানী খুকী যেমন মায়ের আদরে আরও বেশী ফুঁপাইয়া উঠে শাহেরবানুর অবস্থাও তেমনি হইল। তিনি আবার বলেন ঃ

নালায়ে মান. নিস্তেনালা আঁছুয়ে মান নিস্ত আঁছু।

খুনে জিগর. গীতে ফেরাক. আজ জুদায়. মাহবুবে তু!!

আমার এই কান্না কান্না নহে. আমার এই অশ্রু অশ্রু নহে। কান্নাগুলি বেদনার গান. আর অশ্রু হইল কলিজার ক্ষরিত রক্ত যাহা তোমার প্রিয় হাবিবের বিরহে মূর্ত হইতেছে।

এমনিভাবে কাঁদিয়া গাহিয়া শাহেরবানুর দিন কাটিতে লাগিল। নাওয়া নাই. খাওয়া নাই. শুধু কাঁদেন। প্রতিদিনই নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থীরা আসিয়া তাঁহার দরজা হইতে ফিরিয়া যায়।

একদিন শেরদিল আসিয়া শাহেরবানুকে সান্ত্বনা দিতে প্রয়াসী হইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন. এ দুঃখজনক খবর কাফুরের মারফত কারাগারস্থ সকল মুসলমান জানতে পেরেছে এবং ব্যথায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। সকলেরই ভাঙ্গা বুক নিসৃত দীর্ঘশ্বাসে কারাগারে এখন যেন মরুর লু-হাওয়া বইছে। সবাই আপনার কাছে সান্ত্বনা পাবার এবং তালিমের আশায় আসে। কিন্তু আপনার অবস্থা দর্শনে অধিকতর ব্যথা নিয়ে ফিরে যায়। অথচ এভাবে আপনাকে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। যেহেতু আপনিই আমাদের সকলের দিশারী. আপনি এভাবে নিজকে তিলে তিলে ক্ষয় করে দিলে আমাদের আর কেউ থাকল না। তালিমও যাবে বন্ধ হয়ে।

শাহেরবানু বলিলেন. আমি খুবই মর্মাহত হয়ে পড়েছিলাম কারাধ্যক্ষ। হঠাৎ করে ধাক্কাটা সামলাতে পারিনি। আর কোন ভয় নেই। আর কাউকে ফিরে যেতে হবে না। আজ থেকে তালিম চলবে। শাহেরবানু একটু চুপ থাকিয়া আবার বলিলেন. কিন্তু আমার প্রশ্ন হল. মহানবী যে ইনতিকাল করেছেন এ খবরটা আমরা এতদিন পাইনি কেন? এ খবর কি মাদায়েনে পৌছেনি?

শেরদিল বলিলেন. পৌছেছে মাদর। সম্রাট নিশ্চয় জানেন। কিন্তু সে খবর কারাপ্রাচীর ডিঙ্গিয়ে আমাদের কাছে পৌছেনি। শেরদিল বাহির হইয়া গেলেন।

শাহেরবানুর বেদনাহতের জন্য বন্দী মুসলমান ও কর্মচারীদের মধ্যে যে হতাশা ও বিশৃংখলা দেখা দিয়েছিল তাহা দূরীভূত হইল। তালিমও পূর্ববৎ নিয়মিত চলিতে লাগিল।

৮

কারাগারের মুসলমান বন্দী ও কর্মচারিগণ এতদিন জানিয়া আসিতেছিল যে অচিরেই মহনবী মাদায়েন দখল করিবেন এবং তাহাদের উদ্ধার করিবেন। কিন্তু মহানবীর মৃত্য সংবাদে তাহারা নিদারুণভাবে মর্মাহত হইল বুঝি বা তাহাদের মুক্তির আর কোন উপায় হইবে না! তাহাদের এই মনোবেদনার কথা তাহারা শাহেরবানুর কাছে বলিতে লাগিল. আমাদের মুক্তির কি কোন উপায় হবে না আম্মি? মহানবী নেই. তবে কে আমাদেরকে কারাগার থেকে উদ্ধার করবেন. তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী কি তবে আর বাস্তবে পরিণত হবে না? আপনি না বলেছেন. ইসলাম গ্রহণ করলে বিগত জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তবে কি আল্লাহ আমাদের কারাবরণের অন্যায় অপরাধগুলি ক্ষমা করেন নি যার জন্য মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় হচ্ছে না?

শাহেরবানু সকলকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন. নিশ্চয় আল্লহ আপনাদের গুনাহ. অন্যায়. অপরাধ সবই ক্ষমা করেছেন এবং তাঁর সাহায্যও নিকটবর্তী। তিনি বলেছেন.

"ইন্নাল্লাহা য়াগফিরুজ জুনুবা জামিয়া।"

নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেন। তিনি আরও বলেন. "ওয়া নাছরুল্লাহে কারীব "এবং আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে। আপনারা ধৈর্য ধারণ করুন। "ইন্নাল্লাহা মাআছ ছাবেরীন" নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্য ধারণকারীর সঙ্গে আছেন।

বন্দীরা বলিল. আমরা ধৈর্য ধারণ করেই আছি আম্মি। আপনিই আমাদের সকল প্রকার সান্ত্বনার আধার. পথের দিশারী. দাবি আবদারের মধ্যমণি। আপনি আমাদের মুক্তির উপায় করুন আম্মি।

শাহেরবানু বলিলেন. যদিও আমি আপনাদের মতই একজন সাধারণ বন্দিনী মাত্র. তবু আমি আপনাদের মুক্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। বন্দীগণ খুশী হইয়া চলিয়া গেল।

এই নিয়া শাহেরবানু শেরদিলের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। শেরদিল বলিলেন. এ ব্যাপারে আমার কোন বুদ্ধিই জোগাচ্ছে না আম্মি. যা বন্দীদের কোন উপকারে আসতে পারে। আপনার দেয়া সিদ্ধান্তই আমি মেনে নেব। আপনি ভেবে দেখুন কোন উপায় হয় কিনা।

শাহেরবানু বলিলেন. আমার মনে হয় মদীনায় খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে আবেদন করলে একটা উপায় হতে পারে। বলা বাহুল্য শেরদিলও এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। কিন্তু সমস্যা হইল খলীফার দরবারে পাঠাইবেন কাহাকে।

শেরদিল ইহার সমাধান দিয়া বলিলেন, কাফুর যেহেতু একবার মদীনায় গিয়াছে। কাজেই এবারও তাহাকেই পাঠানো যায় কি?

মহানবী ও হযরত ফাতেমা (রাঃ)-র বিয়োগব্যথা শাহেরবানু কিছুদিনের মধ্যে সামলাইয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর কথা বিস্মৃত হইতে পারিলেন না, বরং মহানবী ও হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে হারাইয়া হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-কেই পাওয়ার জন্য মন-প্রাণ তাঁহার আরও বেশি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহার উপায় কি? একবার তিনি ভাবিয়াও ছিলেন শেরদিলের কাছে বলিয়া কাফুরকে আবার মদীনায় হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর নিকট পাঠান যায় কিনা। কিন্তু নিজের মনের কথা লইয়া হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর কাছে পাঠাইবার জন্য শেরদিলের নিকট হইতে কাফুরকে চাহিয়া লইতে লজ্জায় তাঁহার মন সরিল না। এইবার শেরদিলের প্রস্তাবে তাঁহার আকাঙ্ক্ষার স্ফুরণ হইবার সম্ভাবনা আছে মনে করিয়া তিনি মনে মনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করিয়া বলিলেন, কিন্তু আপনার কোন অসুবিধা হবে না তো?

শেরদিল বলিলেন, জী না আম্মি। আমার কোন অসুবিধাই হবে না। গত তারিখের মত এবারও সবাই জানবে যে, কাফুরকে আবার অন্য কারাগারে বদলি করা হয়েছে। আর সম্রাটের দিকটা আমি সামলে নেব। আজ রাত্রেই কাফুর আপনার কাছে আসবে। তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে পাঠাবেন। ওদিকে তার যাবার ব্যবস্থা আমি করে রাখব। এই বলিয়া শেরদিল সালাম দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে কাফুর শাহেরবানুর কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। শাহেরবানু বলিলেন, তোমাকে আবার মদীনায় যেতে হবে।

কাফুর নম্র হইয়া বলিল, কার কাছে যেতে হবে আম্মি।

শাহেরবানু বলিলেন, যাবে হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর কাছে। কেন যাবে সেটা পরে বলছি। তার পূর্বে আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দাও। যে রাত্রে তুমি মদীনা হতে ফিরে এসে মহানবীর ও হযরত মা ফাতেমা (রাঃ)-র মৃত্যুর খবর দিলে তখন আমার মানসিক অবস্থা এমন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, তোমার সব খবর আমি শুনতেও পারিনি এবং আমার সব খবর জানাও হয়নি। এবার বল মদীনায় থাকাকালীন নবী পরিবারের কারো সাথে তোমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছে কি?

কাফুর বলিল, জী আম্মি! সাক্ষাৎ পরিচয় হয়নি, তবে দেখেছি।

শাহেরবানু সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, সে কেমন করে? কাফুর বলিতে লাগিল, হযরত আলী (রাঃ)-কে মসজিদে নববীতে নামাজ পড়তে দেখেছি। কিন্তু কোন কথা হয়নি। অন্য একজনকে জিজ্ঞাসা করে শুধু চিনেছি। হযরত হাসান ও

হোসাইন (রাঃ) ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখেছি নানাজীর রওজার কাছে নামাজ প'ড়ছেন, মোনাজাত করছেন আর কাঁদছেন।

শাহেরবানু তাঁহার সমস্ত চেতনা দিয়া শুনিয়া যাইতেছেন কাফুরের কথা। কাফুর বলিয়া যাইতেছে, আহা! সে কী ক্রন্দন! নানাজীর বিরহ ব্যথার সে কী শোক প্রকাশ! যেই শুনছেন সে-ই ভ্রাতৃযুগলের সুরে সুর মিলিয়ে কাঁদছেন। কী বলব আম্মি! মাটির মানুষ তো নয়, যেন নূরের তৈরী ফেরেস্তা! একবার তাঁদের দিকে তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না। আকাশের চাঁদেও তো কিছু কলংক আছে কিন্তু ভ্রাতৃযুগলের চেহারা কলংকহীন পূর্ণিমার চাঁদ। হাসলে মনে হয় যেন মুক্তা গড়িয়ে পড়ছে, চাহনি দেখলে মনে হয় যেন অন্তরভেদী দৃষ্টিবাণ, চোখ দুটো যেন দুটি নীল সাগর, কথা শুনলে মনে হয় যেন প্রভাতী পাখীর কাকলি শুনছি, চেহারার দিকে তাকালে মনে হয় যেন পায়ে গড়িয়ে পড়ি! মদীনার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁদেরকে যেমন স্নেহ করেন তেমনি ভালবাসেন, তেমনি শ্রদ্ধাও করেন। সবাই বলেন তাঁদেরকে দেখতে নাকি অবিকল নবীজীর মত। কথা শেষ করিয়া কাফুর মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখে শ্রোতা পলকহীন চোখে তন্ময় হইয়া তাহারই দিকে চাহিয়া যেন বুভুক্ষুর মত কথাগুলি গিলিয়া নিতেছেন। কাফুর এক বিস্ময়-মাখা দৃষ্টি দিয়া শাহেরবানুর দিকে তাকাইয়া রহিল। সে ভাবিতেছে শাহেরবানুর এই তন্ময়তা কেন? কাফুরের মনে একটি সন্দেহের ছায়া।

শাহেরবানু বলিলেন, তাঁদের সাথে তোমার কোন কথা হয়নি?

শাহেরবানুর মুখের দিকে তাকাইয়া কাফুর যেন তাঁহার মনের নিরুক্ত কথাগুলি পড়িবার চেষ্টা করিতেছে। সে তেমনি চাহিয়া থাকিয়াই উত্তর দিল, জী, না আম্মি কোন কথা হয়নি।

শাহেরবানু যেন স্বপ্নের ঘোরেই বলিয়া ফেলিলেন, কেন? হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর সঙ্গে দেখা করে দুটি কথা বলতে পারলে না?

নিজের কথা নিজের কর্ণে প্রবেশ করিতেই শাহেরবানু লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিলেন।

এক ঝটকায় শাহেরবানুর মনোরাজ্যের অধীশ্বর সম্বন্ধে কাফুরের মনে সন্দেহের যে মেঘ জমিয়াছিল, তাহা কাটিয়া গেল! সে শাহেরবানুর হৃদয় মন্দিরের অভ্যন্তর পর্যন্ত দেখিতে পাইল। কাফুর আবিষ্কার করিল এক নতুন শাহেরবানুকে। তাহার মনে পড়িল মদীনায় যাইবার সময় শাহেরবানু টানিয়া টানিয়া বলিয়াছিলেন, "আর দেখতে চাই তাঁর আদরের নাতি হযরত হোসাইনকে! সেইদিনও শাহেরবানুর চেহারা এমনি শরম লাজে রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল।

কাফুর শাহেরবানুর মুখের উপর হইতে দৃষ্টি মেঝের উপর স্থাপন করিয়া বলিল, আমার বড়ই কসুর হয়ে গেছে আম্মি! গোস্তাকী মাফ করুন। এবার ঠিকই কথা বলে আসব আম্মি!

শাহেরবানু সলজ্জ বলিলেন. কি কথা বলে আসবে কাফুর?

আবার মুখ তুলিয়া কাফুর বলিল. নবীজীর কাছে আপনার যে সব কথা বলার ছিল. সে কথাগুলো আমি তাঁর কাছে বলব।

শাহেরবানু একে একে তাঁহার গলা হইতে মহামূল্যবান মোতির মালা. হস্তদ্বয় হইতে মারজানী কংকন জোড়া. কর্ণদ্বয় হইতে মণিকুন্ডলদ্বয়. বাজুদ্বয় হইতে বাজু জোড়া. কটিদেশ হইতে মেখলা. কবরী হইতে বন্দনী এবং অনামিকা হইতে হীরাকাংগুরী খুলিয়া কাফুরের হাতে দিতে দিতে বলিলেন. তাঁকে আমার সালাম জানিয়ে বিনীতভাবে এগুলি তার করকমলে দিয়ে বলবে. দীনার এ তুচ্ছ হাদীয়া গ্রহণ করে যেন কৃতার্থ করেন! চরণাশ্রিতা এ দাসী চিরদিন তাঁর কৃতজ্ঞ। আরও বলবে. কারাগারের বন্দী মুসলমানদের যেন উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন।

কাফুর বলিল. তিনি নিতান্তই ছেলে বয়সের মানুষ. তিনি কি করে উদ্ধারের ব্যবস্থা করবেন আম্মি?

শাহেরবানু কাফুরকে বুঝাইয়া বলিলেন. খলীফাকে দিয়েই তিনি সে ব্যবস্থা করবেন। তুমি শুধু তার কাছে বলবে। আর আমি তোমাকে একটি কথা সাবধান করে দিচ্ছি। আমার কোন কথাই তাঁকে ছাড়া আর কারো কাছে বলবে না। যাও কাফুর! তুমি সবই বোঝ। তাঁর চাঁদ মুখের প্রতিউত্তর নিয়ে যথাশীঘ্র সম্ভব ফিরে আসবে।

কাফুর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করিতে করিতে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। শাহেরবানু হাত তুলিলেন. য়া বারে এলাহী।

গারচে মানদুখ্ তরমাজুছী আয় রাহীম!

তুদাদীমান. রাছিরাতাল মোছতাকীম!!

হে দয়ালু! যদিও আমি একজন অগ্নি-উপাসকের মেয়ে. তবু তো তুমি আমাকে সরল সহজ পথ দেখিয়েছ।

দরবারে তু - আরজু আক্নুন জুলজালাল!

তাজে ছৈয়দ দরছেরেমান - কুন্ জামাল!!

হে ক্ষমতাময়! তোমার দরবারে এখন আমার নিবেদন. আমার মস্তক ছৈয়দী তাজে মন্ডিত কর।

কাফুর কারা ফটকে আসিয়া দেখিল শেরদিল নিজেই তাহার জন্য অপেক্ষমাণ। তিনি দ্বাররক্ষীকে দ্বার খুলিয়া দিতে ইংগিত করিলেন। দ্বার রক্ষী দ্বার খুলিয়া দিলে কাফুর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

কাফুরের কানে কানে শেরদিল বলিলেন. খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ)-র নির্দেশে মুসলিম বাহিনী পারশ্য সীমান্ত আক্রমণ করেছেন। তাই সম্রাট নগর ও

নির্দেশে মুসলিম বাহিনী পারশ্য সীমান্ত আক্রমণ করেছেন। তাই সম্রাট নগর ও সেনা নিবাসের সমস্ত উট-ঘোড়া যুদ্ধের জন্য মৌজুদ করেছেন। কাজেই তোমার জন্য কোন সওয়ারী সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। কাজেই তোমাকে পদব্রজেই মদীনা যেতে হবে।

কাফুর স্মিতহাস্যে বলিল, আল্লাহ মেহেরবান! দোয়া করবেন যেন বাসালামত মদীনায় পৌঁছে নিজ দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হই। কাফুর বিস্‌মিল্লাহ বলিয়া অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

শেরদিল কাফুরের গমন পথের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন, হে খোদা! তুমি আমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য যা উত্তম তাই ব্যবস্থা কর।

৯

রাত্রির অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই কাফুর মাদায়েনের শহরতলী এলাকা ও ফুরাত নদী পার হইয়া গ্রামের মধ্যে যাইয়া পড়িল। তাহার মনে নানা দুশ্চিন্তা. নানা ভাবনা।

গত তারিখে কারাধ্যক্ষের বদৌলতে সেনাবাহিনীর একটি তেজী তাজী পাইয়া বড় বাঁচিয়া গিয়াছিল। খুব সহজেই এই বন-জংগল মরু-পাহাড়ের বন্ধুরময় রাস্তা অতিক্রম সহজতর হইয়াছিল। তদুপরি হঠাৎ জেরুজালেমগামী একটি সওদাগরী কাফেলা পাইয়া তাহার বড় সুবিধা হইয়াছিল। কাফেলার সাথেই সে নিরাপদে মদীনার পথে অনেকটা পথ চলিয়া গিয়াছিল। তারপর ওয়াদীয়ে মরহান অতিক্রম করিয়া মাসান ও তাবুকের রাস্তায় বনি কাদহা বস্তি পার হইয়া ফদক পৌছিয়াছিল। ফদক হইতে খায়বার হইয়া সে মদীনায় গিয়াছিল। কিন্তু আজ! সুদূর ছয় শত মাইলেরও বেশী পথ মদীনা। পায়দলে এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে কতদিন লাগিবে কে জানে! রাস্তায় আছে দস্যু তসকরের ভয়। সঙ্গে আছে বহু মূল্যবান অলংকার। নিঃসঙ্গ নিরস্ত্র অবস্থায় এতদূর যাওয়ার উপায় কি?

কাফুর লোকালয় এড়াইয়া অতি সাবধানে অপেক্ষাকৃত নির্জন পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। কারাধ্যক্ষ যে সামান্য পরিমাণ খাদ্য ও পানীয় দিয়াছিলেন. তাহাই সামান্য পরিমাণে গ্রহণ করিয়া কেবল জীবন রক্ষা করতঃ কাফুর পথ চলিতে লাগিল। রাত্রিবেলা পাহাড়ের গুহায় অথবা বৃক্ষোপরি আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিশা যাপন করে। তাহার ধারণা কোন রকমে শাসানীয় রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া আরবের মুসলিম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেই সে নিরাপদ। কারণ সে রাজ্যে আর দস্যুতস্করের ভয় নাই। সেখানে আছে ন্যায়ের শাসন।

নুরী পাথরে পূর্ণ পার্বত্য দূর পথে. মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকাময় রাস্তায় চলিতে চলিতে কাফুরের বহু দিনের পুরাতন পাদুকা একেবারে অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। একেবারে খালি পায়েও হাঁটিতে পারে না। তাই বন্যলতার দ্বারা পাদুকাদ্বয় পায়ের সাথে বাঁধিয়া লইল। কিন্তু তাহাতেই সমস্যার সমাধান হইল না। হাঁটিতে হাঁটিতে পায়ের কব্জি ফুলিয়া গিয়াছে। ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর. পরিশ্রান্ত কাফুর এক নির্জন উপত্যকার গিরিছায়ায় বসিয়া পড়ন্ত বেলায় বিশ্রাম করিতেছে আর অস্ফুট স্বরে বলিতেছে. য়া আল্লাহ! তুমি আমায় সাহায্য কর। মদীনা মুনাওয়ারায় যাওয়ার উপায় করে দাও। তুমি "নেয়ামাল মাওলা ওয়া নেয়ামান নাছির"।

কাফুরের মুখের কথা তখনও মুখেই রহিয়াছে। সহসা গম্ভীর কণ্ঠে শব্দ হইল. "কে রে বেটা তুই মুসলমান? মদীনার গুপ্তচর! মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ । মদীনা যাবার সখ এখনি মেটাব।"

কাফুর সম্মুখে চাহিয়া দেখে তাহার বক্ষ বরাবর বর্শা উদ্যত করিয়া আজরাইলসম এক ভীমকায় পুরুষ দন্ডায়মান। তাহার চোখে মুখে হিংস্রতার ছাপ। সহসাই কাফুরের হাত তাহার কটিদেশে পুটলী করিয়া বাঁধা অলংকার গুলির উপর স্থাপিত হইল। অসীমসাহসী কাফুর তড়িৎ গতিতে দাঁড়াইয়া হাঁকিল কে রে বেটা তুই তস্কর?

কি বললে? আমি তস্কর? এই বলিয়া আগন্তুক কাফুরের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করিতে হস্ত উত্তোলন করিয়াই সহসা দেখিল কাফুর কি একটা পুটলী কোমরের সাথে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। কিছু উপরি পাওনার আশায় সে উদ্ধত বর্শা কাফুরের বক্ষদেশে স্থাপন করিয়া বলিল, তোকে সম্রাটের দরবারে যেতে হবে। তোকে আমি বন্দী করলাম। আর যদি তোর হাতে ধরা ওগুলো কি তা আমাকে দেখাস্ এবং দিয়ে দিস্ তবে তুই মুক্ত।

যতক্ষণ পারা যায় আসন্ন মৃত্যুকে দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়া মুক্তির কোন উপায় করা যায় কিনা, তাহার জন্য কাফুর উত্তর করিল, তুই নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান। ঠিকই ধরেছিস আমি মুসলমান, যাবও মদীনাতেই। তবে আমি গুপ্তচর নই।

আগন্তুক সরোষে বলিল, যাচ্ছে তাই হ । ওতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। তুই ওটা স্বেচ্ছায় দিবি কিনা বল?

কাফুর বলিল, কোন অবস্থাতেই ওটা তোকে দেব না। তবে জাহান্নামে যা। এই বলিয়া আগন্তুক গায়ের জোরে দুই হাতে চাপিয়া কাফুরের বক্ষে বর্শা বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। কাফুর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মৃত্যুকালে উচ্চ স্বরে কালেমায়ে তৈয়্যব পড়িতে লাগিল, "লাইলাহা ইল্লালাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্।

সহসা দ্রুত ধাবমান কতগুলি অশ্বপদধ্বনি শুনিয়া আগন্তুক চকিত হইয়া উঠিল। সে পিছনে ফিরিয়া চাহিয়া দেখে আট/দশজন অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ তাহার ঘাড়ের উপর আপতিত প্রায়। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অশ্বারোহিগণ কাফুরের মুখে আল্লাহর নাম শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। তাঁহারা আগন্তুককে কাফুরের বক্ষ হইতে বর্শা সরাইয়া লইতে ইংগিত করিলেন। সে মন্ত্রবৎ আদেশ পালন করিল। সৈনিক পুরুষগণ তাহাকে বন্দী করিলেন।

বক্ষদেশ হইতে বর্শা সরিয়া যাওয়ায় কাফুর চাহিয়া দেখিল চাকা ঘুরিয়া গিয়াছে। সে আনন্দে "আলহামদু লিল্লাহে হাম্‌দান কাছিরান" বলিয়া আল্লাহর প্রশংসা করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে বন্যার স্রোতের মত হাজার হাজার অশ্বারোহী, উষ্ট্রারোহী ও পদাতিক বাহিনীতে উপত্যকা ছাইয়া গেল।

আল কাতিফ অঞ্চলে পারস্য বাহিনী কর্তৃক সেনাপতি মুসান্নার গতিরোধ হইলে খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ)-র নির্দেশে সিরিয়া হইতে বীরশ্রেষ্ঠ খালিদ বিন অলিদ (রাঃ) ১৮ হাজার সৈন্য লইয়া মুসান্নার সহিত মিলিত হইবার জন্য এই পথে আল কাতিফের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। ইহাদেরই অগ্রবাহিনীর

হাতে আগন্তুক ও কাফুর ধরা পড়িল। সৈনিকগণ দুইজনকেই সেনাপতি খালিদের সম্মুখে হাজির করিলেন।

খালিদ (রাঃ) কাফুরকে প্রশ্ন করিলেন, তোমার নিবাস কোথায় ভাই?

মাদায়েন। কাফুরের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

খালিদ (রাঃ) বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, মাদায়েনে তো এখনও ইসলাম পৌছেনি। তুমি মুসলমান হলে কেমন করে?

শাহেরবানুর সাবধান বাণী স্মরণ করিয়া কাফুর সংক্ষেপে জানাইল যে, সে সিফিরের কাছে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। সিফিরের বর্তমান অবস্থানের কথাও জানাইল। কারাগারের কোন কথাই সে উল্লেখ করিল না।

সিফিরের খবর হযরত শুনিয়া খালিদ (রাঃ)খুবই দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, মক্কা বিজয়ে সে আমার অনুগামী ছিল। কথা ছিল মাদায়েন গিয়েই সে সপরিবার মদীনায় চলে আসবে এবং আমার সঙ্গে যোগদান করবে। কিন্তু কেন যে সে আসতে পারেনি তা এখন বুঝতে পারলাম। যাক, ধৈর্য ধারণ কর ভাই। সম্রাট ইয়াজিদগার্দের দিনও ঘনিয়ে এসেছে, সিফিরের মুক্তিও আসন্ন।

খালিদ কি যেন ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছিলে তা তো বললে না ভাই? আর তোমার নামটিই বা কি?

কাফুর বিনম্র হইয়া বলিল, আমার নাম কাফুর। আমি মদীনায় যাচ্ছিলাম।

খালিদ স্মিতহাস্যে বলিলেন, তা বেশ। এখন ইচ্ছে করলে তুমি মদীনায় যেতে পার। আমি তোমার সওয়ারীর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আর ইচ্ছে করলে আমাদের সঙ্গে জেহাদেও যেতে পার।

সেনাপতির ব্যবহারে কাফুর এতই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে, সে খালিদ বিন অলিদ (রাঃ)-এর শেষোক্ত প্রস্তাবটিই সানন্দ গ্রহণ করিয়া জেহাদে রওনা হইল। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর আগন্তুক তস্করকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু সে মহাবীর খালিদের উদারতায় মুগ্ধ হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিল এবং জেহাদে শরীক হইয়া ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করিল।

হাফির ও রাজকন্যার দুর্গ যুদ্ধে কাফুরের বীরত্বের পরিচয় পাইয়া হযরত খালিদ মুগ্ধ হইলেন। এদিকে পারস্য সম্রাট ইয়াজদিগার্দ মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে সেনাপতি বাহমনের নেতৃত্বে আরও একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি খালিদ (রাঃ) পর পর ওয়ালাজা ও উলিজের যুদ্ধে বাহমনী বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়া হীরা ও আনবারা অধিকার করিলেন। প্রতিটি যুদ্ধেই কাফুর অপূর্ব বীরত্ব দেখাইয়া সকলের মন জয় করিয়াছিল।

ইতিমধ্যে সিরিয়া সীমান্তে গোলযোগ বাড়িয়া যাওয়ায় খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ) আবার খালিদ বিন অলিদকে সিরিয়া সীমান্তে চলিয়া যাইবার জন্য নির্দেশ পাঠাইলেন।

খালিদ (রাঃ) সিরিয়া যাওয়ার পূর্বে কাফুরকে সেনাপতি মুসান্নার হাওলা করিয়া দিয়া বলিলেন, ভাই মুসান্না, একে মদীনায় পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবেন। আর কাফুরকে বলিলেন, ভাই কাফুর তোমার মত একজন সৈনিক পেয়ে আমি সত্যি গর্বিত ছিলাম। তুমি আমাদের সকলের গৌরব।

হযরত খালিদ (রাঃ) সসৈন্যে সিরিয়ার পথে যাত্রা করিলেন। কাফুর অশ্রু বিগলিত চোখে বিদায়ী সেনাপতির গমন পথের দিকে তাকাইয়া রহিল।

মহাবীর খালিদ বিন অলিদ সিরিয়ায় চলিয়া গিয়াছে এই সংবাদ পাইয়া হীরা পুনর্দখল করিবার জন্য সম্রাট ইয়াজদিগার্দ বিপুল উদ্যমে সৈন্য সংগ্রহ শুরু করিলেন। সেনাপতি মুসান্না নতুন করিয়া সৈন্য সংগ্রহের আশায় মদীনা রওনা হইলেন। বলাবাহুল্য কাফুরও মদীনা যাত্রা করিল।

মুসান্না যখন মদীনা পৌছিলেন তখন খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ) মৃত্যুশয্যায় শায়িত। মুমূর্ষ খলীফার কাছে যখন মুসান্নার আগমনের কারণ ব্যক্ত করা হইল, তৎক্ষণাৎ তিনি পরবর্তী নির্বাচিত খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)কে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, আমি যদি রাত্রে মারা যাই তবে সকালেই আর যদি দিনে মারা যাই তবে রাত্রেই মুসান্নাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সৈন্য দিয়ে বিদায় করবেন।

খলীফা কখন মারা যান এই অপেক্ষায় মুসান্নাকে বেশ কিছুদিন মদীনায় অবস্থান করিতে হইল। কাফুর যেদিন মদীনায় পৌছিল তাঁহার দশ/বারো দিন পূর্বেই হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) মক্কায় স্বগোত্রীয়দের বাড়ীতে বেড়াইতে চলিয়া গিয়াছেন। এই সপ্তাহেই তাঁহারা ফিরিয়া আসিবেন। কাজেই কাফুরকেও কয়েকদিনের জন্য মদীনায় অবস্থান করিতে হইল।

৬৩৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে আগস্ট সোমবার ইসলামের প্রথম খলীফা মহামতি হযরত আবুবকর (রাঃ) ইনতিকাল করিলেন। পরবর্তী খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) ২৪শে আগস্ট প্রয়োজনীয় সাহায্য দিয়া সেনাপতি মুসান্নাকে পারস্য সীমান্তে প্রেরণ করিলেন।

১০

মহানবীর তিরোধানের পর সমগ্র আরবে ধর্মত্যাগী ও ভন্ড নবীদের বিদ্রোহ শুরু হয়। তারই সূত্র ধরিয়া বাহরাইনেও বিদ্রোহ দেখা দিলে পারস্য সম্রাট তৃতীয় ইয়াজদিগার্দ বিদ্রোহীদের সৈন্য দ্বারা সাহায্য করেন। ইহাতে সম্রাট খলীফার বিরাগভাজন হইলেন। তদুপরি পারস্য বাহিনী আরব সীমান্তে উস্কানিমূলক ও নাশকতামূলক কার্যকলাপ শুরু করিলে খলীফা পারস্য অভিযান করিতে বাধ্য হইলেন। খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ) বীরশ্রেষ্ঠ খালিদ বিন অলিদের নেতৃত্বে ১৮ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী পারস্য সীমান্তে প্রেরণ করিলেন। সম্রাট ইয়াজদিগার্দও বিখ্যাত পারস্য বীর সেনাপতি হরমুজানের নেতৃত্বে ৬০ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী মুসলমানদের মোকাবিলার জন্য প্রেরণ করিলেন। হাফির নামক স্থানে উভয় বাহিনীর এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। দ্বন্দ্ব যুদ্ধে খালিদের হাতে হরমুজানের পতন ঘটিল এবং সেনাপতি বাহমানের পরিচালনায় সমবেত যুদ্ধে বিরাট পারস্য বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

পাঠকবর্গ আগেই অবগত হইয়াছেন যে, খলীফার নির্দেশেই মহাবীর খালিদ সিরিয়া সীমান্ত হইতে মুসান্নার সাহায্যের জন্য আল কাতিফ আসিয়াছিলেন। মুসান্না ও খালিদের মিলিত বাহিনীটি খালিদের নেতৃত্বেই পরিচালিত হইয়াছিল। মহাবীর খালিদ আরও অগ্রসর হইয়া 'রাজকন্যার দুর্গ' নামক দুর্গটি অধিকার করিলেন। তৎসঙ্গে ওফলাজা, উলিজ, হীরা আনবারাও খালিদের নেতৃত্বে অধিকৃত হইল। এর পরেই খালিদ খলীফার নির্দেশেই আবার সিরিয়া সীমান্তে চলিয়া গিয়াছেন।

সম্রাট ইয়াজদিগার্দ রাজকন্যার দুর্গে বসিয়াই যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছিলেন। খালিদের হাতে দুর্গের পতন ঘটিলে সম্রাট প্রাণটুকু লইয়া কোন রকমে রাজধানী মাদায়েনে পৌঁছিলেন।

কাফুর মদীনা যাত্রা করার চল্লিশ দিন পর এই খবরগুলি শেরদিলের মাধ্যমে শাহেরবানু জানিতে পারিলেন। খবর শুনিয়া তাঁহার যেন আর আনন্দ ধরে না! মহানবীর ভবিষ্যৎ বাণীর বাস্তব রূপ নিবার সূচনা মুসলমানদের এই বিজয়গুলি হইতেই শুরু হইয়াছে, এই মনে করিয়া শাহেরবানুর মনে আশার আলো প্রজ্বলিত হইল।

এই খবর পাইয়া কারাগারে বন্দী মুসলমানগণ একে একে শাহেরবানুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করিতে লাগিল। তাহারা এমনও বলিতে লাগিল যে, কারাগার হইতে মুক্তি পাইলেই তাহারাও ইসলামের জন্য জেহাদ করিবে।

আবার সেই নমরূদী উত্তাপ নিয়ে জ্বলে ওঠ। ধ্বংস কর মুসলিম বাহিনী, জ্বালিয়ে দাও তাদের গোঁফ-দাড়ি। রক্ষা কর আমাদের সকলকে, রক্ষা কর তুমি নিজেকে।”

পূজা শেষ করিয়া সম্রাজ্ঞী গৃহে ফিরিয়া আসিলেন বটে! কিন্তু মনে শান্তি ফিরিয়া পাইলেন না। আজ আবার নূতন করিয়া তাঁহার শাহেরবানুর কথা মনে পড়িল। সে কাছে থাকিলে হয়ত মাতৃহৃদয় কিছুটা আজ তৃপ্ত হইত। কি আশ্চর্য মেয়ে! যে মুসলমানরা আজ আমাদের ধ্বংস করিতে উদ্যত সেই মুসলমানদের ধর্ম গ্রহণ করিয়া সে হাসিমুখে কারবাস মানিয়া নিল!

মুসলমানদের হাতে সম্রাট পরাজিত। তদুপরি মুসলমানগণ মাদায়েন দখল করিতে উদ্যত। এইসব খবর জানিতে পারিলে শাহেরবানু নিশ্চয়ই তাহার ভুল বুঝিতে পারিবে এবং ঘৃণায় ইসলাম ত্যাগ করিয়া স্বধর্মে ফিরিয়া আসিবে। এই মনে করিয়া শাহেরবানুকে ইতিবৃত্ত জ্ঞাপন করিতে সম্রাজ্ঞী কারাগারে যাওয়ার মনস্থ করিয়া সম্রাটের মতামত জানিতে চাহিলেন, যদি শাহেরবানু স্বধর্মে ফিরিয়াই আসে, এই আশাতেই সম্রাট সম্রাজ্ঞীকে কারাগার পরিদর্শনে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করিলেন।

সম্রাজ্ঞীর কারা পরিদর্শনে যাওয়ার কথা শেরদিলকে জানাইয়া দেওয়া হইল। শেরদিল যথামর্যাদায় সম্রাজ্ঞীকে কারাফটকে অভ্যর্থনা জানাইবার সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। স্থির হইল, কারাগারের সমস্ত বিভাগ পরিদর্শন শেষ করিয়া সম্রাজ্ঞী সর্বশেষ শাহেরবানুর সঙ্গে দেখা করিবেন।

সম্রাজ্ঞী কারা পরিদর্শনে আসিতেছেন শুনিয়া বন্দীদের মাঝে আনন্দের বান নামিয়া আসিল। কারণ সম্রাজ্ঞী কারা পরিদর্শনে আসিলে হতভাগ্য বন্দীদের একবেলা বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা হয়। কাহারো বা এক দুই সপ্তাহ সাজা মাফ হইয়া যায়, কাহারো বা শ্রম মওকুফ হইয়া যায়।

যথাসময়ে শেরদিল শাহেরবানুকে যাতা ঘুরাইবার কাজে বহাল করিয়া দিলেন, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানিতে দিলেন না যে, কেন আজ তাঁহাকে এই কাজ করিতেই হইবে। শাহেরবানুও এর কারণ জানিতে চাহিলেন না। তিনি ভাবিলেন, হয়ত সম্রাট আজ কারা পরিদর্শনে আসিতেছেন। কর্মচারী ও বন্দীগণ স্ব স্ব কাজে মনোনিবেশ করিল।

যথাসময়ে সম্রাজ্ঞী দিলরাজবানু সম্রাটের প্রথম পক্ষের দুই কন্যা গুলবানু ও পরীবানু পরিবারকে সঙ্গে লইয়া কারাগারে প্রবেশ করিলেন। কারাধ্যক্ষ শেরদিল সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাদেরকে কারাগারের সকল বিভাগ এবং বন্দীদের অবস্থা দেখাইতে লাগিলেন। সম্রাজ্ঞী যে বিভাগেই যান সেখানেই বন্দীগণ সম্রাজ্ঞীর জয় ঘোষণা করিয়া করজোড়ে বলিতে লাগিল, মাদরে আকলীম গোস্তাখী মাফ কুন। মাদরে আকলীম গোস্তাখী মাফ কুন। হে রাজ্যমাতা অপরাধ ক্ষমা করুন! হে রাজ্যমাতা, অপরাধ ক্ষমা করুন!!

সম্রাজ্ঞী প্রফুল্ল মনে সেখানে কিছু সময় দাঁড়াইয়া কাহার কি অপরাধ, কতদিন সাজা হইয়াছে তাহা শ্রবণ করেন এবং কাহারো এক সপ্তাহ, কাহারো বা দুই তিন সপ্তাহ পর্যন্ত কারাবাস ক্ষমা করিয়া দেন। শেরদিল সঙ্গে সঙ্গে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া নেন।

পরিদর্শন কার্য সমাপ্ত করতঃ সকল বন্দীর জন্য একবেলা শাহী ভোজের ব্যবস্থা করিয়া সম্রাজ্ঞী সর্বশেষ গেলেন শাহেরবানুর কক্ষে। তিনি তখন প্রাণপণে যাতা ঘুরাইয়া আটা প্রস্তুত করিতেছিলেন এবং তন্ময় হইয়া জিকির করিতেছিলেনঃ

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লা!

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু!! লা ইলাহা ইল্লাল্লা!!

শাহেরবানু জিকিরে এতই মশগুল ছিলেন যে, কখন কে তাঁহার দ্বারদেশে মা, দুই ভগ্নি ও কারাধ্যক্ষ আসিয়া দাঁড়াইতেছেন তাহা তিনি টের পান নাই। জিকিরের সুরে সম্রাজ্ঞী স্তম্ভিত, দুই সহোদরা মোহিত এবং কারাধ্যক্ষ চমৎকৃত হইয়া ঠাঁয় নির্বাক-নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

নদী তপে ঢেউ আছড়াইয়া পড়ার মত জিকিরের প্রতিটি শব্দ সম্রাজ্ঞীর মনের তটে আঘাত হানিতে লাগিল এবং বিধৌত হইতে লাগিল দিল দরিয়ার বেলাভূমি। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আহা! তাঁহার পেটের মেয়ে শাহেরবানু এই শেরে শিরিন কোথায় শিখিল? ইহার কি অর্থ? পাছে এই মধুবর্ষী সুর বন্ধ হইয়া যায় এই শংকায় তিনি শাহেরবানুকে ডাকিতে পারিলেন না। স্তম্ভবৎ দাঁড়াইয়া সমস্ত চেতনায় উপভোগ করিয়া যাইতেছেন এই সুর লহরী।

গ্রীষ্মের তাপে পোড়া মাটি বারিধারা পানে যেমন তৃপ্ত হইতে থাকে এবং উপযোগী হইতে থাকে শ্যামল রূপ ধারণ করার তেমনি সম্রাট তনয়া দুই সহোদরার অগ্নি দেবতার পূজারী পোড়ামন নূরে হেরার আলো সিঞ্চনে প্লাবিত হইতে লাগিল। দুই সহোদরা এই অশ্রুতপূর্ব অমিয় বাণী শ্রবণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন শাহেরবানু একি গজল শিখিয়াছে! ইহার কি কোন অর্থ নাই? সে কি ইহার অর্থ জানে? ইহা কোন কবির রচনা? দুই ভগ্নি সুরের তালে তালে দুলিতে লাগিলেন, এই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া এক সময় গুলবানু ডাকিলেন, শাহেরবানু! কিন্তু কে শোনে কার ডাক? আবার ডাকিলেন, শাহেরবানু!! কিন্তু এবারও শাহেরবানুর কর্ণে সে ডাক পৌঁছিল না। এবার দুই ভগ্নি এক সাথে ডাকিলেন, শাহেরবানু!!

সম্বিত ফিরিয়া পাইয়া শাহেরবানু চাহিয়া দেখেন দ্বারদেশে ইঁহারা দন্ডায়মান। এসে অভাবনীয় ব্যাপার। তিনি ছুটিয়া গিয়া মায়ের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সম্রাজ্ঞী মেয়ের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে কাঁদিয়া ফেলিলেন, তাঁহার মেয়ে কারাগারে সাধারণ কয়েদীর মত যাতা পিষিতেছে? এতক্ষণে এই ব্যথা তাঁহার

মনে উথলাইয়া উঠিল। দুই সহোদরার চোখেও অশ্রু ছাপাইয়া আসিল। এই দৃশ্য শেরদিলের সহ্য হইল না। তিনি ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

সম্রাজ্ঞী বলিতে লাগিলেন, একি দেখলাম শাহেরবানু, তুই এ কাজ করছিস! এ যে অসহ্য! তুই কেন এ পথ বেছে নিলি?

শাহেরবানু মা ও ভগ্নিদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বন্দিনীর উপযুক্ত কাজই তো করছি! তা দেখে আপনাদের দুঃখ করা উচিত নয়।

সম্রাজ্ঞী বলিলেন, তুই স্বধর্মে ফিরে আয় মা। তবেই তোর আব্বা তোকে মুক্তি দেবেন। আমি এ কথা নিয়েই তোর কাছে এসেছি। এই বলিয়া তাঁহারা উপবেশন করিতে উদ্যত হইলে শাহেরবানু তাহাদেরকে নিজের কক্ষে ডাকিয়া আনিয়া বসাইলেন এবং প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া বলিলেন, আমি তো স্বধর্মেই ফিরে গেছি মা। ইসলাম যে সকলেরই স্বধর্ম। আপনারাও স্বধর্মে ফিরে আসুন।

সম্রাজ্ঞী আবার বলিলেন, শুনলে তোর মনে ঘৃণা আসবে যে, মুসলমানেরা আমাদের রাজ্য আক্রমণ করেছে। শাহেরবানু হাসিয়া বলিলেন, আমি সব শুনেছি মা।

সম্রাজ্ঞী বলিলেন, তবু তুই তাদের ধর্মই মেনে চলবি?

শাহেরবানু বিনম্র হইয়া বলিলেন, এ যে সত্য ধর্ম মা! আমাদের রাজ্য সম্বন্ধে মহানবীর ভবিষ্যৎ বাণী যে বাস্তব হতে চলছে তা এখনও বুঝতে পারেন নি?

সম্রাজ্ঞী ভাবিত হইয়া পড়িলেন, তিনি বলিলেন, কি জানি মা! আমি অতশত বুঝি না। তবে তুই ইসলাম পরিত্যাগ করবি না?

শাহেরবানু দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, না, মা! ইসলাম পরিত্যাগ করব না, বরং আমার কিছু কথা শোনেন। তবেই বুঝতে পারবেন কেন আমি এ পথ বেছে নিলুম।

সম্রাজ্ঞী নীরব হইলেন।

গুলবানু বলিলেন, তার আগে বল শাহেরবানু, তুই যে গজল আবৃত্তি করছিলি, এটা কি? তা কোথায় পেলি এবং তা পড়লে কি হয়?

শাহেরবানু মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ভগ্নিদ্বয়ের দিকে চাহিয়া গাহিলেন,

ই' গজল আঁ, নূরে হেরা, খান্দায়িম!

দর ছববে, জিন্দান ইঁবু, দাম ছালিম!!

ইহা হেরা পর্বতের ঐ আলো আমি যাহা সব সময় পাঠ করি যাহার কারণে এই কারাগার আমার জন্য শান্তি নিকেতনে পরিণত হইয়াছে।

আঁকে আতশ কুলজাঁহানয়, দা কুনাদ!

দরশেরেইঁ,হামদে বে-হদ, উকুনাদ!!

যিনি অগ্নি ও সমস্ত সৌর জগত সৃষ্টি করিয়াছেন এই সুমিষ্ট ছড়ায় তাঁহারই সীমাহীন প্রশংসা করা হয়।

শাহেরবানু বলিতে লাগিলেন, আপনারাও মনে প্রাণে এই কালেমা উচ্চারণ করুন। ইহকালে ও পরকালে শান্তি লাভ হবে। আল্লাহ উত্তমরূপে আপনাদের পুরস্কৃত করবেন।

শাহেরবানু সূরায়ে কাহাফের শেষ চারিটি আয়াত সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত করিলেন। তেলাওয়াতের প্রতিটি শব্দ সম্রাজ্ঞী ও দুই সহোদরার কাছে এক মধুময়ী বয়েত বলিয়া প্রতীয়মান হইল। প্রতিটি শব্দই গভীরভাবে তাঁহাদের মনে শান্তির পরশ বুলাইয়া দিল।

সম্রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিলেন, এর রচয়িতা কে শাহেরবানু আর অর্থই বা কি? তুই এ কোথায় শিখলি?

শাহেরবানু মায়ের হাত ধরিয়া বলিলেন, কোন মানুষ এটি রচনা করেনি মা। যিনি আকাশ-জমিন-গ্রহ-তারা সৃষ্টি করেছেন, এটি যে সেই মহান পরওয়ারদিগারের বাণী আল-কোরআন। জিব্রিল মারফত আল্লাহপাক তা মহানবীর কাছে পাঠিয়েছেন। সিফির মামার নিকট আমি এ কোরআন শিখেছি। আমি যেটুকু পাঠ করেছি তার অর্থ শুনুন।

"নিশ্চয়ই যাহারা মহান আল্লাহ এবং তাঁহার রাছুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং সৎ কাজ করিয়াছে তাহাদের জন্য "ফেরদাউস" নামক স্বর্গের মেহমানী বরাদ্দ রহিল (আয়াত ১০৭)। সেখান হইতে কোন সময়েই স্থান পরিবর্তন হইবে না। (আয়াত ১০৮)। হে মুহাম্মদ (সাঃ), তাহাদেরকে বলুন, যদি সমস্ত সাগর মহাসাগরের সমস্ত পানি কালি হয় এবং তদ্দ্বারা আমার প্রভুর গুণ কীর্তন লেখা শুরু হয় তবে আমার প্রভুর গুণ কীর্তন্ন লেখা শেষ হইবার পূর্বেই সমস্ত কালি নিঃশেষিত হইয়া যাইবে এবং পুনরায় যদি সমস্ত সাগর মহাসাগরগুলি কালি ভর্তি করা হয়, তবও্ব আমার প্রভুর গুণ কীর্তন শেষ হইবে না (আয়াত ১০৯)। হে মুহাম্মদ (সাঃ), তাহাদেরকে বলুন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মত একজন সাধারণ মানুষ। আমার কাছে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ আসে মাত্র। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু মাত্র একজন। তোমাদের মধ্যে যাহারা তাহার প্রভুর সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করিতে চায়, তাহাদের উচিত সৎ কার্যসমূহ করা ও তাহার উপাসনায় কোন অংশীদার যেন গ্রহণ না করে (আয়াত ১১০)।

অর্থ বলা শেষ হইলে গুলবানু ও পরীবানু একযোগে বলিয়া উঠিলেন, মা, এ মহাসত্য আমাদের গ্রহণ করা উচিত। এর প্রতিটি কথাই সত্য এবং মিথ্যা আশ্বাস নয়। সম্রাজ্ঞী মাথা নীচু করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। মেয়ের সম্মুখে মাথা উঁচু করিয়া বসিবার মত মনের জোর যেন তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছেন! মায়ের মনের দোদুল্যমান অবস্থার লক্ষ্য করিয়া শাহেরবানু আবার বলিতে লাগিলেন,

মহানবীর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তব রূপ নেবার প্রাথমিক পর্যায় হিসাবে হরমুজানের পতন, হাফির যুদ্ধের পরাজয়, রাজকন্যার দুর্গের পতন, হীরা পর্যন্ত মুসলিম বাহিনীর বিজয়াভিযান অব্যাহত আছে। মাদায়েনেরও পতন অবশ্যই ঘটবে মা। এখনও সময় আছে, আব্বাকে বলে কয়ে ইসলাম গ্রহণে এবং মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করার জন্য রাজী করান। এতে রাজ্য ও পদমর্যাদা এবং ইহকাল ও পরকাল দুই-ই রক্ষা হবে। জেনে রাখুন, মা মহানবীর বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলবে এবং তা অচিরেই। দেখতেই পারছেন আব্বার কোন প্রতিরোধই কার্যকরী হচ্ছে না। সবই মাকড়সার জালের মত ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

শাহেরবানু পুনরায় সূরায়ে আল এমরানের পঁচিশতম আয়াতটি পাঠ করিয়া তাহার অর্থ উত্তমরূপে মা ও ভগ্নিদ্বয়কে বুঝাইয়া দিলেন,

হে নবী, আপনি বলুন, হে আল্লাহ! তুমি যাহাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান কর, যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনাইয়া লও, যাহাকে ইচ্ছা অপমানিত কর, যাহাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর। তোমার হাতেই সমস্ত কল্যাণ নিহিত। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান।”-আয়াত-২৫

সম্রাজ্ঞী কম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, জানিস তো মা, সম্রাটের মনমেজাজ কেমন? তোর প্রস্তাব সরাসরি তাঁর কাছে পেশ করলে তিনি আমার উপরেও কুপিত হবেন। আমি তোর কথাগুলি তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করব। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে তোর মতের সমর্থক।

শাহেরবানু বলিলেন, শুধু সমর্থ হলে চলবে না মা, আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন।

সম্রাজ্ঞী বলিলেন, আমাকে দু'দিন ভাবতে সময় দে মা। আমি একটু ভেবে নিই। আমি অবশ্যই তোর কথা রাখব। শুধু সম্রাটের নির্যাতনের ভয়েই আমি আমার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলাম না।

গুলবানু বলিলেন, এতক্ষণ শুধু আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম মা। আপনি যা ঘোষণা করতে কুণ্ঠিত হলেন, আমি এই মুহূর্তে তা ঘোষণা করলাম, আমি মুসলমান। আমাকে তুই ইসলামে দীক্ষিত কর শাহেরবানু। অগ্রজার সুরে সুর মিলাইয়া পরীবানুও তৎক্ষণাৎ নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করিলেন।

শাহেরবানু মহানন্দে দুই ভগ্নিকে ইসলামে দীক্ষিত করিলেন। ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক জীবন যাপন করার প্রণালী এবং নামাজ আদায় করার নিয়ম ও দোয়াসমূহ শুনাইতে লাগিলেন।

এবংবিদ আলোচনায় সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। কারাধ্যক্ষ আসিয়া জানাইলেন! ফটকে আপনাদের গাড়ী প্রস্তুত।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাদের উঠিতে হইল। গুল ও পরীবানুর মনে হইল তাহারা যেন গুলিস্তান হইতে রেগিস্তানে যাত্রা করিয়াছেন!

গাড়ীতে বসিয়া সম্রাজ্ঞী ভাবিতেছেন কারাগারে কি করিতে আসিয়া কি করিয়া গেলাম! শাহেরবানুকে তো ফিরাইয়া আনিতেই পারিলাম না, বরং সেই কি সব যাদুময়ী কথা বলিয়া আমাদের ভুলাইয়া ফেলিল! গুল ও পরীবানু তো মত পাল্টাইয়াই আসিল। আহা! কথা তো নয় যেন মধুমাখা বাণী! কেবল শুনিতেই ইচ্ছা হয়। তবে কি শাহেরবানু ভুল করে নাই? সেই কি তবে সত্যের সন্ধান পাইয়াছে! আমরাই তবে ভুল করিতেছি? হয়ত বা তাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোদের কি মনে হয় গুলবানু? শাহেরবানু কি ঠিকই করেছে? তোরাও যে ইসলাম গ্রহণ করে এলি?

গুলবানু উত্তর করিলেন, শাহেরবানু ঠিকই করেছে মা। আমাদেরকেও সে সঠিক পথের সন্ধানই দিয়েছে। তাই ইসলাম গ্রহণ করে এলাম।

বাড়ী ফিরিয়া সম্রাজ্ঞী সম্রাটের কাছে কারাগারে যাওয়ার ফলশ্রুতিতে শুধু বলিলেন যে, শাহেরবানুকে মতিচ্যুত করা গেল না। অধিকন্তু মহানবীর পেশেনগুয়ী যে ফলিতে শুরু করিয়াছে এবং এমতাবস্থায় সম্রাটের কি করা উচিত সে সম্বন্ধে শাহেরবানুর অভিমতও সম্রাটকে জানাইলেন। শুধু গুল ও পরীবানুর ধর্মান্তরের কথা গোপন রাখিলেন।

সব শুনিয়া সম্রাট শুধু বলিলেন, ওর মতিভ্রম হয়েছে বলেই কি আমারও মতিভ্রম ঘটবে? ভেবেছিলাম, ওকে মুক্তি দেব। কিন্তু না। ওকে আর মুক্তি দেয়া হবে না। ওকে আজীবন কারাগারেই থাকতে হবে।

১১

গুল ও পরীবানু ইসলাম গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু ধর্মের মর্মকোষে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের অবস্থা হইল অজু করিতে যাইয়া বে-কায়দায় পড়েন, কেমন করিয়া অজু করিতে হয় তাহা জানেন না। নামাজ পড়িতে যাইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন কেমন করিয়া নামাজ পড়িতে হয় তাহাও বুঝেন না। শাহেরবানু যে সব দোয়া কালাম বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সেইগুলির মনে নাই। পড়িবেন কি? করিবেনই বা কি? নাহ্! এইভাবে হয় না। মনে পড়ে সেই দিন শাহেরবানু কোরআনের একটি শের আবৃতি করিয়া অর্থ বলিয়াছিলেন, "তোমরা পুরাপুরিভাবে ইসলামে প্রবেশ কর।" তাহাই করিতে হইবে। পুরাপুরিভাবেই মুসলমান হইতে হইবে। একমাত্র কালেমায়ে তাইয়েব ছাড়া আর কিছুই তো জানেন না। জানার উপায় কি? দুই ভগ্নিতে বসিয়া শুধু ভাবেন, মাদায়েন কেন, সমগ্র পারস্যে কেউ মুসলমান আছেন বলিয়া তাঁহাদের জানা নাই। কাহার কাছে দ্বীন শিক্ষা করা যায়? উপায় বাহির করিলেন পরীবানু। তিনি বলিলেন, শাহেরবানুই যেহেতু আমাদের দিশারী সেহেতু এ ব্যাপারে আমাদের তাঁরই শরণাপন্ন হতে হবে। তার কাছেই সব শিখতে হবে।

গুলবানু বলিলেন, বটে! কিন্তু তাঁর কাছে যাবে কেমন করে? কারাগারে তো আর নিয়মিতভাবে যেয়ে লেখাপড়া করা যাবে না। পরীবানু বলিলেন, তা ঠিক। তবে নিয়মিতভাবে যাতে কারাগারে থাকা যায় তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পরীবানুর পরিকল্পনা বুঝিতে না পারিয়া গুলবানু জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন করে?

পরীবানু বলিলেন, যুদ্ধ পরিচালনার জন্য আব্বা এখন রাজধানীর বাইরে আছেন। দু-একদিনের মধ্যেই তিনি বাড়ীতে ফিরে আসবেন। তখন তাঁর কাছে আমরা আমাদের ইসলাম ঘোষণা করব। তখন তিনি গোসা করে আমাদেরকেও কারাগারে পাঠিয়ে দেবেন।

গুলবানু পরীবানুর বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া তাঁহার কথামতই কাজ করিবার সিদ্ধান্ত নিয়া সম্রাটের আগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

যথা বুদ্ধি তথা কাজ। কয়েকদিন পর সম্রাট রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলে দুই সহোদরা পিতৃ সকাশে যাইয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, আমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি আব্বা, আপনিও ইসলাম গ্রহণ করুন তা হলেই সব ল্যাঠা চুকে যাবে।

মুসলমানদের হাতে পরাজিত হইয়া এমনিতেই সম্রাট জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছিলেন। তদুপরি নিজের মেয়েদের মুখে এই কথা শুনিয়া তিনি হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হইয়া গর্জিয়া উঠিলেন, কি

বললে কুলাংগারের দল, যে দুশমনকে সমূলে খতম করার জন্য সর্বস্ব হারাচ্ছি, সে দুশমন বারংবার আমার ঘরেই গজাচ্ছে? দাঁড়া, দেখাচ্ছি তোদের মজা! দৌবারিক?

যমদূতের মত একজন দারওয়ান কুর্নিশ করিয়া আসিয়া সম্রাটের সম্মুখে দাঁড়াইল। সম্রাট ক্রোধ কম্পিতভাবে নির্লিপ্ত কণ্ঠে নির্মম আদেশ জারি করিলেন। দুই সহোদরাকে দেখাইয়া বলিলেন, এদের দুইজনের হাতে পায়ে কন্টকিত লৌহ শৃংখল পরিয়ে যম কুঠুরীতে নিয়ে যা। কারাগারের জল্লাদকে বলবি আজ রাতের মধ্যেই এদের দু'জনকেই তাইগ্রীসের একবুক জলে দাঁড় করিয়ে হত্যা করতে। এদের অপবিত্র দেহ ও রক্তে আমার পারস্য ভূমি অপবিত্র হোক তা আমি চাই না। তাইগ্রীসের স্রোতে ভেসে যাক এদের দেহ ও রক্ত দু-ই। এই নে মৃত্যু পরওয়ানা।

সম্রাট গুল ও পরীবানুর মৃত্যু পওয়ানা সই করিয়া দারওয়ানের হাতে তুলিয়া দিলেন।

দন্ডাদেশ শুনিয়া দুই সহোদরার কণ্ঠ-তালু রোধ হইয়া আসিল। তাঁহারা নির্বাক কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া মনে মনে আল্লাহর নাম জিকির করিতে লাগিলেন।

অকল্পনীয় দন্ডাদেশের কথা শুনিয়া দরবারের সভাষদবর্গ, মন্ত্রীপরিষদ সকলেই করজোড়ে শাহজাদীদের প্রাণ ভিক্ষা চাহিতে লাগিল। কেহ বা তাঁহাদের আজীবন কারাবাসের জন্য আবেদন করিল। কিন্তু কে শোনে কার কথা?

গুল ও পরীবানুর পরিণামের কথা শুনিয়া বাড়ীময় কান্নার রোল পড়িয়া গেল। সম্রাজ্ঞীদ্বয় ও অন্যান্য ছেলেমেয়ে সম্রাটের পায়ে পড়িয়া গুল ও পরীবানুর প্রাণ ভিক্ষা চাহিতেছে। গুল ও পরীবানুর মা নাদিরা ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইতেছেন। গোলাম-বাদীরা বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়া গড়াগড়ি যাইতেছে। এই দৃশ্য দেখিলে পাষাণ ফাটিয়া বুঝি ঝর্ণা নির্গত হয়, কিন্তু সম্রাট অনঢ়। অধিকন্তু তিনি ঘোষণা করিলেন, গুল ও পরীবানু সম্বন্ধে কেউ কোনরূপ সুপাারিশ করিলে তাহারও অনুরূপ অবস্থা হইবে।

সম্রাটের ঘোষণা শুনিয়া যেন প্রত্যেকের হৃদ-স্পন্দন থামিয়া গেল! চোখের জ্যোতি নিবিয়া দিন দুপুরে নামিয়া আসিল অমানিশার অন্ধকার। গুল ও পরীবানু সম্বন্ধে কেহ আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। সবাই নীরবে অশ্রু মুছিতে লাগিল।

যথাযথভাবে সম্রাটের আদেশ পালিত হইল। দারওয়ান দুই ভগ্নিকে কন্টকিত শৃংখলে হাত-পা বাঁধিয়া যম কুঠুরীতে উপুড় করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া কারাগারে জল্লাদের কাছে তাঁহাদের মৃত্যু পওয়ানা দিয়া অন্য নির্দেশাবলীও বলিয়া আসিল।

গভীর রাত। যম কুঠুরীতে দুই বোন শুধু কালেমায়ে তাইয়্যেব জপিতেছেন

আর মৃত্যুর প্রহর গুণিতেছেন। পিপাসায় কণ্ঠ-তালু লাগিয়া আসিতেছে। বক্ষদেশ হইয়া আসিল মরুভূমির মত। ক্ষুধায় নাড়ী-ভূরি পাকাইতে লাগিল। জল্লাদের খড়্গাঘাতের পূর্বেই বুঝি প্রাণ-বায়ু বাহির হইয়া যাইবে! পরীবানু পানি পানি বলিয়া কাতরাইতেছেন, কিন্তু কে দিবে একটু পানি, কে দিবে একটু আহার্য। উপুড় হইয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহাদের নাসিকা হইতে রক্তক্ষরণ শুরু হইল। হাত পাগুলি আড়ষ্ট হইয়া আসিল। বেদনায় সমস্ত শরীর জর্জরিত। গুলবানু বলিতে লাগিলেন, দুঃখ করিসনে বোন। মৃত্যুই মানুষের অবশ্য পরিণতি। তার জন্য আর দুঃখ করে কি হবে?

পরীবানু বলিলেন, আমি দুঃখ করছি নে আপা; আমার শুধু একটি কামনা আল্লাহ যেন ঈমানের সাথে মৃত্যু দেন!

সহসা যম কুঠরীর দরজা খুলিয়া গেল। ক্ষীণ প্রদীপ হস্তে কে একজন ঘরে প্রবেশ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালে একটি কালো ছায়া ভূতের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইল। অনেক কষ্টে আড় চোখে ছায়াটি দেখিয়া গুলবানু চিনিলেন জল্লাদ এক হস্তে খড়্গা এবং অন্য হস্তে প্রদীপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তিনি বলিলেন, আর দেরী কেন জল্লাদ, তোমার কাজ সম্পন্ন কর, সকল কষ্টের অবসান হোক।

ভীমকায় জল্লাদ কোন উত্তর না করিয়া শৃংখলিত অবস্থাতেই দুই বোনকে উঠাইয়া বাহিরে অন্ধকারে দণ্ডায়মান একটি খচ্চরের উপর বস্তা বোঝাই করার মত পালানের সাথে কষিয়া বাঁধিয়া অন্ধকারেই মিলাইয়া গেল। গুল ও পরীবানুর মনে হইতে লাগিল শক্ত দড়ির বাঁধনগুলি বুঝি কাটিয়া শরীরে প্রবেশ করিতেছে! তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন জল্লাদ তাঁহাদের কোথায় লইয়া যাইতেছে। তাইগ্রীসের দূরত্ব যতই কমিয়া আসিতেছে ততই কষ্টের লাঘব প্রায় হইল বলিয়া এই আশাতেই ভগ্নিদ্বয় নীরবে আল্লাহর নাম স্মরণ করিয়া চলিয়াছেন।

গভীর রাতের নির্জন পথে জল্লাদ মাহতাব খচ্চরের লাগাম ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে আর ভাবিতেছে, আমার অপরাধ কি? আমি চাকরি করি। সম্রাটের চাকরি সম্রাটের আদেশ পালন করাই আমার চাকরী। পাপ হয়, অন্যায় হয় সম্রাটের হইবে। আমার কি? তা না হইলে নরহত্যা। একি ক্ষমার যোগ্য? কে না জানে নরহত্যা মহাপাপ! এই পাপ কি আমি স্বেচ্ছায় করি? পাপ করেন সম্রাট। সম্রাট অন্যায়ের সাজা দেন। - - - কিন্তু! এরা কি অন্যায় করিয়াছিল? এরা কাহারা? ইহাদের পরিচয় কি? এমন ফুলের মত দুইটি জীবন আজ আমার হাতে বিনষ্ট হইবে? কী জঘন্য চাকরি আমার! নাহ্, এই চাকরি ছাড়িয়া দিতে হইবে!

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে আকাশে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চন্দ্রোদয় হইলে অন্ধকার কিছুটা হালকা হইয়া আসিল। তাইগ্রীসের তীরে পৌঁছিয়া জল্লাদ ভগ্নিদ্বয়কে খচ্চর হইতে টানিয়া নামাইয়া হাত ও পায়ের বাঁধন খুলিয়া ফেলিল। সে গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, আপনারা উঠে দাঁড়ান।

কিন্তু ভগ্নিদ্বয় কিছুতেই উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না। হাতে পায়ে খিল

ধরিয়া গিয়াছে। কিছুতেই আর মেলিতে পারিতেছেন না।

জল্লাদ তাড়া দিয়া বলিল, চলুন, পানির ধারে যেতে হবে।

পানির কথা শুনিয়া তাঁহাদের তৃষ্ণা যেন আরও প্রবল আকার ধারণ করিল! কিন্তু উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না। গুলবানু বলিলেন, দাঁড়াতে পারছি না। যাব কেমন করে জল্লাদ?

মাহতাব বলিল, তাহলে আমি টেনে হিঁচড়ে নিতে বাধ্য। গুলবানু বলিলেন, টেনে হিঁচড়ে নেবে? তার চেয়ে এখানেই হত্যা কর না কেন?

মাহতাব দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, তা হয় না। এক বুক পানিতে দাঁড় করিয়ে হত্যা করতে হবে। আমি টেনেই নিয়ে যাব। এই বলিয়া মাহতাব ভগ্নিদ্বয়কে টানিতে উদ্যত হইল। গুলবানু বলিলেন, থাম জল্লাদ। আমরাই চেষ্টা করছি, এই বলিয়া গুলবানু অতি কষ্টে হামাগুড়ি দিয়া চলিতে গিয়া পড়িয়া যান। আবার কুনুইয়ে ভর করিয়া চলেন। পরীবানুও গুলবানুর অনুকরণে চলিতে লাগিলেন।

অনেক কষ্টে এক সময় তাঁহারা বেলাভূমি পার হইয়া পানির কিনারায় পৌঁছিলেন এবং অঞ্জলি ভরিয়া পানি পান করিলেন। তাঁহাদের প্রাণ শীতল হইল। আহা! পানি পানে এমন তৃপ্তি বুঝি তাঁহারা জীবনে আর পান নাই।

মাহতাব বলিল, আপনারা একবুক পানিতে যাইয়া দাঁড়ান। ভগ্নিদ্বয় উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিলেন বটে! কিন্তু পারিলেন না। পড়িয়া গেলেন।

মাহতাব বুঝিল, ইঁহাদের উঠিয়া দাঁড়াইবারও ক্ষমতা নাই। সে বলিল, ঠিক আছে। এখানেই আপনাদের হত্যা করব। এখনি জোয়ার আসবে। জোয়ারের পানিতেই আপনাদের দেহ ও রক্ত ভাসিয়ে ধুয়ে নিয়ে যাবে। আপনারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হোন। এই বলিয়া মাহতাব খড়্গ বাহির করিল।

দুই হাতে ভর করিয়া গুলবানু মস্তক কিঞ্চিত উঁচু করিয়া বলিলেন, মৃত্যুর পূর্বে আমার একটি আব্দার রক্ষা করবে জল্লাদ?

মাহতাব বলিল, তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন কি আব্দার। সম্ভব হলে রাখব।

গুলবানু বলিলেন, আমার সম্মুখে আমার ছোট বোনকে হত্যা করবে, আমি তা সহ্য করব কি করে? তুমি আমাকে আগে হত্যা করে সে যন্ত্রণার লাঘব কর।

মাহতাব গুলবানুর গ্রীবা লক্ষ্য করিয়া খড়্গ উত্তোলন করিল। পরীবানু চিৎকার দিয়া বলিলেন, আমার সম্মুখে আমার বড় বোনকে হত্যা করবে জল্লাদ? আমি তা কেমন করে দেখব? তুমি আমাকেই আগে হত্যা কর। এতটুকু দয়া তোমার কাছে ভিক্ষা চাই।

আমাকে আগে হত্যা কর। আমাকে আগে হত্যা কর। এই বলিয়া দুই ভগ্নি একযোগে চিৎকার করিতে লাগিলেন।

ওদিকে জোয়ার আসার শোঁ শোঁ শব্দ ক্রমেই নিকটবর্তী হইতে লাগিল। মাহতাব কিংকর্তব্যবিমূঢ়! সে বলিল, হত্যাকার্য সম্পন্ন করতে যেয়ে এমন কিংকর্তব্য অবস্থায় আমি কখনও পড়িনি। আপনাদের কারও কথাই আমি আর

শুনব না। আমি নিয়মমাফিক কাজ করে যাব। বড়টিকেই আগে হত্যা করব। আপনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হোন।

এই বলিয়া মাহতাব গুলবানুর গ্রীবা লক্ষ্য করিয়া খড়্গ উত্তোলন করিল। চন্দ্রালোকে খড়্গ চকচক করিয়া উঠিল। পরীবানু চক্ষু বন্ধ করিলেন। গুলবানু উচ্চারণ করিলেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।"

মাহতাবের খড়্গোত্তোলিত হস্ত শূন্যেই আটকাইয়া রহিল, গুলবানুর গ্রীবায় নামিয়া আসিল না। ধীরে ধীরে মাহতাবের মুষ্টিবদ্ধ হাত শিথিল হইয়া গেল। হস্ত হইতে খড়্গ খসিয়া গিয়া "ঘছ" করিয়া বালুকায় বিদ্ধ হইল। ধপ করিয়া সে গুলবানুর শিয়রের কাছে বসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কি মুসলমান? গুলবানু টানিয়া বলিলেন, হ্যাঁ জল্লাদ, আমরা মুসলমান।

মাহতাব বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের পরিচয়?

আমরা সম্রাটের কন্যা। গুলবানু আর পরীবানু। এই বলিয়া গুলবানু হাঁপাইতে লাগিলেন।

ইঁহাদের পরিচয় শুনিয়া মাহতাবের চোখের ছানা বড় হইয়া উঠিয়া পলকহীন হইয়া রহিল। কি আশ্চর্য? ততোধিক বিস্ময় মাখা কণ্ঠে মাহতাব জিজ্ঞাসা করিল, শাহজাদী শাহেরবানু আপনাদের কে?

গুলবানু মাহতাবের মুখের দিকে তাকাইয়া কথা বলিতে চাহিলেন, কিন্তু পারিলেন না। জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া আসিল। পরীবানু ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, সে আমাদের অনুজা।

ততক্ষণে বেলাভূমি ছাপাইয়া প্রবল বেগে জোয়ারের পানি আসিয়া পড়িয়াছে। গুলবানুর দেহ পানিতে ভাসিয়া উঠিল। তিনি সাঁতরাইবার চেষ্টা করিয়া কেবল খাবি খাইতেছেন। পরীবানুও ডুবু ডুবু করিয়া ভাসিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন।

মাহতাব কিংকর্তব্যবিমূঢ়! সহসা সে ছুটিয়া গিয়া দুই শাহজাদীকে দুই কোলে চাপিয়া ধরিয়া ত্রস্তে কূলের দিকে দৌড়াইতে লাগিল। জোয়ারের পানিও যেন তাহার সঙ্গে সমান তালে দৌড়াইতেছে! যত শক্তিশালীও হোক না কেন মাহতাবের পক্ষে দুই পাজরায় দুইজন অচেতন প্রায় মানুষকে লইয়া দৌড়ানো খুবই কষ্টকর হইল। একবার সে হোঁচট খাইয়া পড়িয়াও গেল। আবার সে দুইজনের বাহু আকর্ষণ করিয়া ছুটিল। এমনিভাবে ভিজিয়া চুপসিয়া এক সময় সে তীরের উপর আসিয়া উঠিল। তাহার বুকে তখন হাতুড়ি পিটার শব্দ হইতেছে। সে বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল। দুই সহোদরা তখন সংজ্ঞাহীনা।

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া মাহতাব তাঁহাদের জ্ঞান সঞ্চারে বিভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করিল। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁহাদের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মালিত করিয়া গুলবানু তাঁহাদের বর্তমান অবস্থাটা স্মরণ করিতে পারিলেন। তিনি চতুর্দিকে তাকাইয়া পরীবানুকে খুঁজিতে লাগিলেন। পরীবানুকে তাঁহার পার্শ্বে দেখিতে পাইয়া ডাকিলেন, পরী!

পরীবানু চক্ষু মেলিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, আপামণি তুমি কেমন আছ?

গুলবানু বলিলেন, হাঁ বোন। আল্লাহ মেহেরবান! তুই এখন কেমন বোধ করছিস?

পরীবানুর সংক্ষিপ্ত উত্তর, ভাল।

গুলবানু মাহতাবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমাদেরকে হত্যা না করে এমনভাবে বাঁচালে কেন জল্লাদ?

মাহতাব বলিল, আমিও যে মুসলমান শাহজাদী! এক মুসলমান আর এক মুসলমানকে হত্যা করতে পারে না।

গুল ও পরীবানু বিস্মিত কণ্ঠে একযোগে প্রশ্ন করিলেন, তুমি দ্বীন শিখেছ কোথায় জল্লাদ?

মাহতাব বিনীতভাবে বলিল, শাহজাদী শাহেরবানুই আমার উস্তাদ। তিনিই আমাকে নূরে হেরার সন্ধান দিয়েছেন শাহজাদী। প্রথম বুঝতে পারিনি, এখন বুঝতে পারছি আপনাদের দুর্ভাগ্যের কারণ কি?

পরীবানু জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন আমাদের কি করবে?

বিনম্র মাহতাব বলিল বলুন, কোথায় গেলে আপনারা নিরাপদ, সেখানেই আমি আপনাদের পৌঁছে দেব।

গুলবানু বলিলেন, আমাদের ইচ্ছে ছিল কারাগারে যেয়ে শাহেরবানুর কাছে তালিম নেব।

মাহতাব খুশী হইয়া বলিল, তবে চলুন কারাগারেই আপনাদের আমি পৌঁছে দেব।

কিন্তু আমরা সেখানে এখন নিরাপদ কিনা বলতে পার? গুলবানুর কণ্ঠে সংশয়ের সুর।

মাহতাব দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, সম্পূর্ণ নিরাপদ।

গুলবানু তবু সংশয়ের কণ্ঠে বলিলেন, কিন্তু সম্রাট জানতে পারলে আমাদের ও তোমার অবস্থাটা কেমন হবে ভেবে দেখেছ কি?

মাহতাব আরও দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, ভেবে চিন্তেই বলেছি শাহজাদী। কারাগারটি সম্রাটের রাজ্যভুক্ত হলেও কার্যত তা এখন মদীনার খলীফার আওতাভুক্তই বলতে পারেন। শাহেরবানুর প্রচারে ও প্রচেষ্টায় কারাগারের অধিকাংশ বন্দী ও কর্মচারী এখন মুসলমান। স্বয়ং কারাধ্যক্ষও ইসলাম গ্রহণ করেছেন। শাহজাদী শাহেরবানুই প্রকৃতপক্ষে কারাগারের নিয়ন্ত্রক। আমরা সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ দাস। কাজেই আপনারা কারাগারে আছেন এ খবর কারাপ্রাচীর ডিঙ্গিয়ে কোনদিনই সম্রাটের কর্ণগোচর হবে না। সম্রাট জানবেন, তাইগ্রীসের স্রোতে আপনাদের শব ও খুন ভেসে গেছে।

গুলবানু বলিলেন, তবে আমাদের কারাগারেই নিয়ে চল। ত্রস্ততায় এখানে পড়িয়া রহিল পরীবানুর জুতার এক পাটি। যথাসম্ভব আরামের সাথে মাহতাব ভগ্নিদ্বয়কে খচ্চরের উপর বসাইয়া দ্রুত নগরাভিমুখে যাত্রা করিল। ভগ্নিদ্বয় কোন রকমে টাল সামলাইয়া বসিয়া আল্লাহর শুকরিয়া করিতে লাগিলেন।

মাহতাব অনুনয় বিনয় সহকারে বলিতে লাগিল, আমার কৃতকর্মের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন শাহজাদী। অনেক গোস্তাখী করেছি।

গুলবানু বলিলেন, তোমার কোন গোস্তাখী হয়নি। সম্রাটের আদেশ পালন করতে যাচ্ছিলে মাত্র। এ যে তোমার কর্তব্য ছিল! তোমার গোস্তাখী হয়ে থাকলে সম্রাটের কাছে হয়েছে। তাঁর আদেশ পালন করনি।

মাহতাব বলিল, তা হলো বটে। কিন্তু আল্লাহর দরবারে আমার কোন কসুর হয়নি, বরং নরহত্যার গোনাহ থেকে আমি বেঁচে গেলাম।

মাহতাব আবার জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা ঈমানের সন্ধান পেলেন কেমন করে?

গুলবানু তাঁহাদের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী বর্ণনা করিলেন এবং সম্রাটের দন্ডাদেশের কথাও বলিলেন।

এদিকে পূর্বাকাশে সোবহে কাজেব হইয়া আসিল। একটি বাড়ীর ফটকে খচ্চর থামাইয়া মাহতাব ঘন ঘন ফটকদ্বারে করাঘাত করিতে লাগিল। একটু পরই ফটক খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন কারাধ্যক্ষ শেরদিল। তিনি মাহতাবকে দেখিয়া বিস্ময়মাখা কণ্ঠে বলিলেন, এ সময়ে তুমি এখানে কেন মাহতাব? সওয়ারীই বা কারা?

মাহতাব সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল। সব শুনিয়া কারাধ্যক্ষ ত ৎক্ষণাৎ খচ্চর কারাফটকে লইয়া যাইবার নির্দেশ দিয়া তিনিও অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন। তিনি স্বগত উচ্চারণ করিলেন, যেখানে ফেরাউন সেখানেই আছিয়া, মাত্র কয়েক মিনিটের রাস্তা। তাঁহারা ফটকে পৌছিতেই কারাধ্যক্ষের ইশারায় রক্ষী দ্বার খুলিয়া দিল। গুল ও পরীবানু কারাধ্যক্ষ ও মাহতাবের কাঁধে ভর করিয়া পা টানিয়া টানিয়া চলিতে লাগিলেন। তখনও কারাগারে কেহ জাগিয়া উঠে নাই। শাহেরবানু জায়নামাজে বসিয়া অজিফা পড়িতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার দরজায় যাইয়া শেরদিল ডাকিলেন দ্বার খুলুন মাদর।

শাহেরবানু দরজা খুলিয়া দিতেই একযোগে কক্ষে প্রবেশ করিলেন গুল ও পরীবানুকে ধরিয়া লইয়া শেরদিল ও মাহতাব। শাহেরবানু বিস্ময়ে হতবাক!

শেরদিল সংক্ষেপে ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, এদের শুইয়ে দিন, বিশ্রাম করুক। আমি এখুনি এদের চিকিৎসা, খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করে পাঠাচ্ছি। শেরদিল ও মাহতাব বাহির হইয়া গেলেন।

১২

কাফুর তাহার মদীনা আগমনের কারণ গোপন রাখিল। সে দিনের কিছু সময় কাহারো বাগানে বা দোকানে কাজ করিয়া কিছু উপার্জন করিয়া আহার্যের ব্যবস্থা করে এবং মদীনার চারিপার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়ায়। গত তারিখে যেসব স্থান দেখা হয় নাই, এইবার সে সেই সমস্ত স্থান ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিল। রাত্রিবেলা মসজিদে নববীতে কাটায়।

অনর্থক ঘুরিয়া সময় আর কাটে না। ভ্রাতৃযুগল কবে ফিরিয়া আসিবেন তাহাও কেহ সঠিক বলিতে পারেন না। আজ আসিবেন, কাল আসিবেন, এমনি করিয়া কাফুর মদীনায় দুই মাস কাটাইল। অগত্যা সে মক্কা শরীফে যাইয়াই ভ্রাতৃযুগলের চরণ দর্শন করিবে, হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর সঙ্গে গোপনে দেখা করিয়া শাহেরবানুর বার্তা পৌঁছাইবে এবং ওমরা হজ্ব আদায় করিবে এই মানসে মক্কার উদ্দেশে মদীনা ত্যাগ করিল।

যেহেতু কাফুর এখন আর সেনাবাহিনীর লোক নয়, সেহেতু সেনাপতি মুসান্না তাঁহার নির্ধারিত অশ্বটি আর তাহাকে দিয়া যাইতে পারিলেন না। কাজেই কাফুর পদব্রজেই মক্কা শরীফ রওনা হইল। কিন্তু কাফুরকে অধিক দূর যাইতে হইল না। কোবা পল্লী ছড়াইয়া সে কিছুদূর গিয়াছে মাত্র, এমন সময় দেখা গেল পূর্ণ চন্দ্রসম ভ্রাতৃযুগল একটি কাফেলায় উষ্ট্রারোহণে আল্লাহর গুণগান করিতে করিতে ধীরে ধীরে মদীনার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। কাফুর কাফেলার সঙ্গে আবার মদীনার পথ ধরিল। ভ্রাতৃযুগলের ইচ্ছানুসারে কোবা পল্লীতে আসিয়া কাফেলা যাত্রাবিরতি করিল। নানাজীর সুন্নত পালন করিবার জন্য তাঁহারা এখানে কয়েকদিন অবস্থান করিবেন, তার পর প্রবেশ করিবেন মদীনায়।

হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-কে নীরবে-নির্জনে পাওয়া কাফুরের পক্ষে খুবই কষ্টকর হইল। একে তো তাঁহার সঙ্গে সব সময় লোকের ভীড় আছেই, তদুপরি তিনি পারতপক্ষে বড় ভাই হযরত ইমাম হাসানের (রাঃ) সঙ্গ ছাড়িতে চাহেন না। কিন্তু কাফুরও নাছোড়বান্দা। সে সর্বদাই কাজে অকাজে হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর দৃষ্টিসীমায় ঘুর ঘুর করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। সুযোগ পাইলেই হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর এই সেই কাজগুলি করিয়া দিবার প্রয়াসী হয়। অজুর পানি লইয়া যায়, খাবার আগাইয়া দেয় ইত্যাদি।

ইহাতে কাফুরের উপায় সিদ্ধ হইবার সুযোগ আসিল। তাহার এই ঘুর ঘুর ও খেদমতের প্রচেষ্টাটা হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর চোখেও ধরা পড়িল। একদিন তিনি কাফুরকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে ভাই? মনে হয় তোমাকে কাফেলায় নতুন দেখছি।

কাফুরের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। সে তৎক্ষণাৎ সর্দারে শাবাবে জান্নাত হযরত হোসাইন (রাঃ)-কে ছালাম করিয়া দস্তবুছি করতঃ সবিনয়ে বলিতে লাগিল, আমার গাত্রকর্মে হুজুরের পয়জার হোক! গোলাম কাফুর হুজুরের খাদেম। এখানেই কাফেলায় শামিল হয়েছি। গোলামকে হুজুরের চরণে ঠাঁই দিলে কৃতার্থ হব।

এই বলিয়া কাফুরের হস্তদ্বয় হযরত হোসাইনের (রাঃ) চরণদ্বয় স্পর্শ করিতে উদ্যত হইল। মহামতি হযরত হোসাইন (রাঃ) তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া কাফুরকে বুকে টানিয়া লইয়া আলিঙ্গন দিয়া বলিলেন, ওখানে নয় ভাই, এখানে। মুসলমান মাত্রই ভাই ভাই।

কাফুরের জীবন ধন্য হইল। তাহার চোখে বিগলিত হইতে লাগিল আনন্দাশ্রু। চেহারায় ফুটিয়া উঠিল এক স্বর্গীয় জ্যোতি, বুক ভরিয়া উঠিল স্বর্গীয় সৌরভে।

হযরত হোসাইন (রাঃ) কাফুরকে কাছে বসাইয়া সস্নেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি মোসাফির?

কাফুর বলিল, জী হাঁ। আমি মোসাফির।

হযরত হোসাইন (রাঃ) কাফুরের মুখের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমার নিবাস কোথায় ভাই? কাফুর বিগলিত হইয়া বলিল, মাদায়েন।

মাদায়েন?

হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর বিস্মিত কণ্ঠ। সেই কট্টর কাফেরের দেশে? সেখানে তুমি ইসলাম শিখলে কার কাছে ভাই?

কাফুর বলিল, আমার প্রভু সিফির আমাকে ইসলাম শিক্ষা দিয়েছেন। কাফুর সংক্ষেপে সিফির ও তার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী বলিল মাত্র। সে এখন কারাগার হইতে আসিয়াছে ইহার কোন আভাসই দিল না।

কাফুরকে ধন্যবাদ দিয়া হযরত হোসাইন (রাঃ) প্রশ্ন করিলেন, তুমি এদেশে কবে এসেছ এবং যাবেই বা কোথায়?

কাফুর বিনম্র হইয়া বলিল, আমি দু'মাস আপনার জন্য মদীনায় অপেক্ষা করে মক্কায় রওনা হয়েছিলাম।

কিছুটা আশ্চর্য হইয়া হযরত হোসাইন (রাঃ) বলিলেন, আমার জন্য অপেক্ষা? বল ভাই, আমার কাছে তোমার কি প্রয়োজন যার জন্য দুটি মাস তুমি মদীনায় অবস্থান করছ?

কাফুর করজোড় হইয়া বলিল, গোলামের কসুর মাফ হয় হুজুরে আকদাছ। এখানে আমার জবান খুলবে না।

এই মাদায়েনী মোসাফির তাঁহার কাছে কি বলিতে চায় যাহার জন্য

গোপনীয়তা প্রয়োজন, তাহা জানিবার প্রবল কৌতূহলী হইয়া হযরত হোসাইন (রাঃ) কাফুরকে লইয়া একটু দূরে একটি বৃক্ষ ছায়ায় উপবেশন করিয়া বলিলেন, এবার বল ভাই, কি তোমার প্রয়োজন? আমি যথাসাধ্য তোমার উপকার করতে চেষ্টা করব।

সিফিরের মদীনা আগমনের কারণ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার ইসলাম গ্রহণ, শাহেরবানুর ইসলাম গ্রহণের সূত্র ও ঘটনা, মাদায়েন হইতে পলায়ন, প্রহরীদের হাতে তাহাদের সকলের গ্রেফতার, সম্রাটের দরবারের নির্যাতন, কারাবরণ, কারাগারের কঠোরতা, সিফিরের বদলি, তাহার নিজের দুর্ভোগ, শাহেরবানুর ইসলাম প্রচার, বর্তমানে কারাগারে মুসলমানদের সংখ্যা, শাহেরবানুর প্রাধান্য, কারাগার হইতে তাঁহার মুক্তির শর্ত, প্রথমবারে তাঁহার মদীনা আগমনের কারণ, মহানবীর তিরোধান এবং মা ফাতেমার পরলোক গমনে শাহেরবানুর মর্সিয়ার হা-হুতাশ সমস্তই কাফুর একে একে হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-র কাছে বর্ণনা করিল।

সব শুনিয়া হযরত হোসাইন (রাঃ) বলিলেন, ভাই কাফুর, প্রাথমিক যুগে প্রত্যেক মুসলমানের ভাগ্যে এরূপ বিড়ম্বনাই ঘটত। আল্লাহর অনুগ্রহে দ্বীনের বিজয়ে মাজলুম সকলেই আজ সমুন্নত শিরে দাঁড়াতে পেরেছে। তাদের নিগ্রহের দিনও শেষ হয়েছে। কেসরার দৌরাত্ম্যও আর বেশী দিন নেই। সেও বিনষ্ট হবে। নানাজির পত্র ছিন্ন করার প্রতিফল সে রাজ্যে প্রতিফলিত হবেই। তোমাদেরও নিগ্রহের দিন শেষ হয়ে এল প্রায়। ধন্য তোমাদের দ্বীনভক্তি, ধন্য তোমাদের আল্লাহভীতি, ধন্য তোমাদের নবীপ্রীতি। সাবাস তোমাদের ঈমানের জোর!

বিশেষ করে শাহজাদী শাহেরবানুর ধৈর্য, ত্যাগ ও তিতিক্ষার তুলনা হয় না। হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা নামিয়া আসিল। তিনি কান্না বিজরিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, নানাজীকে ও আমার মরহুমা আম্মাজানকে না দেখেই তিনি তাঁদের প্রতি যে শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালবাসার পরাকাষ্ঠা দেখালেন তার দৃষ্টান্ত নেই। তাঁর দ্বীনদারী ও ঈমানদারীর কোন বিকল্প আদর্শ নেই। একজন মেয়ে হয়ে তিনি দ্বীনের যে প্রচার ও খেদমত করেছেন তার শতাংশের একাংশও এখনও আমার দ্বারা হয়নি। আমি তার জন্য দোয়া করি, আল্লাহ তাঁকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

কাফুর সাশ্রু নয়নে বলিল, আপনার দোয়া তাঁর জন্য ব্যর্থ না হোক, আলা হযরত!

হযরত হোসাইন (রাঃ) সস্নেহ বলিলেন, কিন্তু আমার কাছে তোমার প্রয়োজনটি কি তাতো বললে না?

মওকা বুঝিয়া কাফুর এইবার হযরত হোসাইনের (রাঃ) হাত ধরিয়া বলিল, গোস্তাখী মাফ হয় হযরত। ভয় পাই, পাছে কোন বেয়াদবী হয়!

মধুর হাসিয়া হযরত হোসাইন (রাঃ) বলিলেন, ভয় নেই। তুমি নির্ভয়ে বল,

কি বলতে চাও। আমি কিছু বেয়াদবী মনে করব না।

সাহস পাইয়া কাফুর বলিল, শাহজাদী শাহেরবানুর বার্তা নিয়েই গোলাম হুজুরের খেদমতে হাজির। কিছুটা বিস্মিত কণ্ঠে হযরত হোসাইন (রাঃ) বলিলেন, শাহজাদীর বার্তা? বল, তাঁর কি বার্তা নিয়ে এসেছ?

কাফুর বলিল, তিনি আপনাকে সালাম জানিয়েছেন।

"ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু" বলিয়া হযরত হোসাইন (রাঃ) শাহেরবানুর সালাম গ্রহণ করিলেন।

কাফুর সলজ্জভাবে বলিল, তিনি আপনার গুণগান শুনতে সদা উন্মুখ, পাগলিনী প্রায়।

হযরত হোসাইন (রাঃ) দোয়া করিয়া বলিলেন, আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন।

কাফুর ঘাড় নীচু করিয়া বলিল, তিনি আপনার দর্শনপ্রার্থী।

এইবার হযরত হোসাইন (রাঃ) একটু হাসিয়া বলিলেন, শরীয়তে তা বৈধ নয় ভাই।

কাফুর হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর মুখের দিকে চাহিয়া করুণ কণ্ঠে বলিল শাহজাদী বলে দিয়েছেন, তিনি আপনার চরণদাসী।

হযরত হোসাইন (রাঃ) আকাশ পানে চাহিয়া বলিলেন, 'আলহামদু লিল্লাহ!' সমস্তই আল্লাহর ইচ্ছা। শাহজাদীর ইচ্ছা পূর্ণ হতেও পারে।

কাফুর মহানন্দে অলংকারের পুটুলীটি খুলিয়া একে একে মোতির মালা মারজানী কংকন, মণি-মুন্ডল বাজুজোড়া, মেখলা, বন্ধনী ও হীরকাংগুরী সমস্তই হযরত হোসাইনের (রাঃ) পদতলে স্থাপন করিয়া করজোড়ে বিনীতভাবে বলিতে লাগিল, দাসীর এ তুচ্ছ হাদিয়া গ্রহণ করে তাঁকে কৃতার্থ করতে অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন।

অলংকারগুলি দেখিয়া হযরত হোসাইন (রাঃ) বলিলেন, ছোবহানাল্লা এগুলো যে আমার চেয়ে তাঁরই প্রয়োজন বেশী ছিল!

কাফুর বিনীতভাবে বলিল, কিন্তু তিনি যে আপনার চরণে সব দিয়েই ধন্য কৃতার্থ!

হযরত হোসাইন (রাঃ) তাঁহার আমামা খুলিয়া কাফুরের হাতে দিয়া বলিলেন, শুধু হাতে হাদিয়া গ্রহণ করা যায় না। আমার পক্ষ থেকে এটি শাহজাদীর কাছে পৌছে দিও। এই বলিয়া তিনি অলংকারগুলি উঠাইয়া লইলেন।

কাফুর করজোড় হইয়া বলিল, গোস্তাখী মাফ হয় আলা হযরত।

কাফুরের পিঠে হাত রাখিয়া হযরত হোসাইন (রাঃ) বলিলেন, বল কাফুর, আর কি বলবে?

কাফুর বলিল, আলা হযরতের চরণদাসী শাহজাদী হুজুরের আমামার চেয়ে পাদুকা পেলেই বেশী খুশী হবেন

হযরত হোসাইন (রাঃ) হাসিয়া বলিলেন, তুমি শাহজাদীর উপযুক্ত কাসেদই বটে! দুটোই দিচ্ছি। এই বলিয়া তিনি পাদুকাদ্বয়ও খুলিয়া কাফুরের হাতে গুজিয়া দিলেন থলে হইতে একটি শির বন্ধনী বাহির করিয়া কাফুরের হাতে দিয়া বলিলেন, আর এটি দিলাম তোমাকে।

কাফুর যেন বেহেশতের প্রবেশপত্র হাতে পাইল! সে ভক্তি বিগলিত হইয়া বাধা দিবার পর্বেই চট করিয়া হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর কদমবুছি করিয়া ফেলিল। তারপর শির বন্ধনীটি চোখে মুখে লাগাইয়া ইমামের চরণে হাত রাখিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, এ গোলাম পরকারলেও আপনার চরণে ঠাঁই চায়।

হযরত হোসাইন (রাঃ) কাফুরের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "পরকালেও তুমি আমার বন্ধু।"

কাফুর আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। তাহার দুই চক্ষু ছাপাইয়া শ্মশ্রুপ্লাবিত অশ্রু টপ টপ করিয়া হযরত হোসাইন (রাঃ)-র পদযুগল সিক্ত করিতে লাগিল।

হযরত হোসাইন (রাঃ) কাফুরকে কোলে টানিয়া নিয়া অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, কেঁদ না ভাই। তোমার আরও কিছু বলার আছে কি?

কাফুর আর এক দফা হযরত হোসাইনকে (রাঃ) কদমবুছি করিয়া বলিল, জ্বী। বন্দী মুসলমানগণ শাহজাদীর কাছে মুক্তির আবেদন জানিয়েছে। তিনি জানিয়েছেন আপনার কাছে। এ ব্যাপারে আমি তাঁকে কি বলব।

হযরত হোসাইন (রাঃ) বলিলেন, শাহজাদীকে আমার সালাম দিয়ে বলবে বন্দী মুসলমানদেরসহ তাঁকেও উদ্ধার করার আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করব ইনশাআল্লাহ।

কাফুর বলিল, আপনার পক্ষ থেকে তাঁকে কি বলব?

হযরত হোসাইন (রাঃ) বলিলেন, বলবে তাঁর সকল আশা একমাত্র আল্লাহই পূর্ণ করতে পারেন। তিনি যেন ধৈর্য ধারণ করেন। আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখেন, আমি তাঁর জন্য দোয়া করি। আল্লাহ তাঁর মঙ্গল করুন।

কাফুর বলিল, আমীন!!

হযরত হোসাইন (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কবে নাগাদ মদীনা ত্যাগ করতে চাও?

কাফুর বলিল, এখন যে কোন দিন গেলেই হয়। কিন্তু আপনার চরণ ছেড়ে যেতে মন চায় না যে!

হযরত হোসাইন (রাঃ) বলিলেন, তুমিও শাহজাদীর সঙ্গে চলে এসো।

কাফুর আনন্দ গদ গদ কণ্ঠে বলিল, ইনশাল্লাহ!

হযরত হোসাইন উঠিতে উঠিতে বলিলেন, আমরা আজকেই মদীনা প্রবেশ করব। তুমিও আমাদের সঙ্গে চল। মদীনা গিয়েই তোমার সওয়ারীর ব্যবস্থা করে দেব ইনশাআল্লাহ।

মদীনা পৌছিয়াই মহামতি হযরত হোসাইন (রাঃ) কাফুরের জন্য একটি দ্রুতগামী অশ্বের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কাফুর অশ্বারোহণে মাদায়েন রওনা হইল। হযরত হোসাইন (রাঃ) তাহাকে কিছু দূর আগাইয়া দিলেন। কাফুর আগাইয়া চলিল। আর বারংবার পিছনে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। হযরত হোসাইন (রাঃ) ঠাঁয় দাঁড়াইয়া তাহাকে হাত নাড়িয়া বিদায় জানাইতেছেন। কাফুর যতই চক্ষু মুছিয়া ইমাম সাহেবকে দেখিতে চায়, ততই অশ্রু আসিয়া তাহার দৃষ্টিকে ঝাপসা করিয়া দেয়। কাফুরের বক্ষ-বসনসিক্ত। বন্ধুবিরহে হৃদয় মরুতপ্ত। মনে হইল, সে দুনিয়ার সবচে' বেশী নিঃস্ব। রিক্ত।

১৩

অনেক সেবা শুশ্রূষার পর সম্রাজ্ঞী নাদিরা বেগম কিছুটা প্রকৃতিস্থ হইলেন। সম্রাট আজ তাঁহার মহলে আসেন নাই। গভীর রাত্রি- যে যার মহলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু নাদিরার চোখে ঘুম নাই। সম্রাটের নির্মম নির্দেশে তাঁহার অপ্সরীবৎ দুইটি মেয়ে গুলবানু ও পরীবানু জল্লাদের হাতে প্রাণ হারাইল। এমন সোনার প্রতীমা মেয়ে দুইটিকে জল্লাদের হাতে তুলিয়া দিতে পিতার মনে একটুকুও বাধিল না? এমন স্বামী, এমন পিতাও হয়? কিসের স্বামী? জল্লাদ গুল-পরীকে খড়্গা দিয়া কোপাইয়া কাটিয়া ফেলিল? নাদিরার মনে হইল জল্লাদ এখন তাঁহার পাজরের নীচে কলিজার উপর সমানে খড়্গাঘাত করিতেছে। উহ!

ও কিসের শব্দ? কাহার যেন গলার আওয়াজ! তাই তো? গুল ও পরীবানু আসিয়া ডাকিতেছেন, মা! মাগো!!

নাদিরা বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। আবার যেন শুনিলেন মা! মাগো!!

পাছে কেউ জাগিয়া উঠে; তাই অতি সন্তর্পণে পালঙ হইতে নামিয়া ততোধিক সাবধানতার সহিত দরজা খুলিলেন। গুল ও পরীবানুকে ডাকিয়া আনিয়া পালংয়ের নীচে লুকাইয়া রাখিবেন। বাহিরে আসিয়া গুল ও পরীবানুকে পাইলেন না। আহা! বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। তাই অভিমানী মেয়েরা আবার চলিয়া গিয়াছে সেই যম কুঠুরীতে।

যাই! মহলের অলি গলি ঘুরিয়া নাদিরা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া সদর দরজা পার হইয়া গেলেন। তিনি ছুটিলেন তো ছুটিলেন! ছুটিলেন!!

সদর দরজায় তখন দুইজন দারোয়ান মদ্যপান করিয়া মাতলামি করিতেছিল। একজন মাতাল বলিল, কে যায় ও? দ্বিতীয় মাতাল বলিল, লছমী। উভয়ে হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

যম কুঠুরীর দরজায় আসিয়া নাদিরা ডাকিতে লাগিলেন, মা গুলবানু, মা পরীবানু, তোরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আয়! আয়!! জল্লাদ আসার আগেই বেরিয়ে আয়। তোদের আমি পালঙের নীচে লুকিয়ে রাখব। আয়! বেরিয়ে আয় জলদি। তিনি দরজায় করাঘাত করিতে লাগিলেন, খটাখট! খটাখট! আয় মা, রাগ করিসনে। তাড়াতাড়ি চলে আয়। খটাখট! খটাখট!!

এ কি? দরজায় যে তালা ঝুলিতেছে! তবে কি গুলবানু, পরীবানু এখানে নাই। অবশ্যই নাই। থাকিলে সাড়া শব্দ করিত। তবে কি জল্লাদ তাহাদেরকে তাইগ্রীসের তীরে লইয়া গিয়াছে? তাহাই হইবে।

যাই! নাদিরা আবার উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিলেন। তিনি পাগলিনী, উন্মাদিনী। গভীর রাত্রের নির্জন রাজপথ। মহাবিভ্রান্তের মত নাদিরা ছুটিলেন। পথ চেনা নাই।

দূরত্ব জানা নাই। তবু যাইতে হইবে। নদী তীরে পৌঁছিতে হইবে। গুল-পরীকে জল্লাদের হাত হইতে বাঁচাইতে হইবে। নাদিরা ছুটিলেন। ছুটিলেন!! শাবকহারা হরিণীর মত ছুটিলেন। হোঁচট লাগিয়া হুমড়ি খান. আবার ছুটেন। কয়েক জায়গায় ছড়িয়া গিয়াছে। খেয়াল নাই। ব্যথা নাই শুধু ছুটিতেছেন। আর ছুটিতেছেন!!

অনেকটা বেলা হইলে তিনি তাইগ্রীসের তীরে উপনীত হইলেন। কিন্তু কোথায় গুল. কোথায় পরী আর কোথায় বা জল্লাদ? জোয়ারের পানি সরিয়া গিয়াছে। বেলাভূমিতে শুধু বালি আর বালি। জন মানবের কোন চিহ্ন নাই। দিগভ্রান্তের মত নাদিরা এদিকে সেদিকে ছুটাছুটি করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, গুল-পরী, পরী-গুল! গুল-পরী!, পরী-গুল! গুল-পরী, পরী-গুল!!!

এই পেয়েছি! আমার পরীর জুতোর এক পাটি পেয়েছি! আর এক পাটি কোথায়? গুলের জুতোই বা কোথায়? জুতো ফেলে ওরাই বা গেল কোথায়? নাকি জল্লাদ ওদেরকে মেরে ফেলেছে! এখানেই মেরেছে নিশ্চয়! সব ভেসে গেছে জোয়ারের পানিতে ভাটির টানে।

যাই! পানির পাড় ঘেষিয়া নাদিরা ভাটির দিকে ছুটিলেন। হাতে ধরা জুতার পাটি। নাদিরা ছুটিলেন। ছুটিলেন!! মুখে তাঁহার একই বুলি, গুল-পরী, পরী-গুল! গুল-পরী, পরী-গুল!! কত দূর গেলেন কে জানে। বেহুশ! বেখেয়াল!! সূর্য মাথার উপরে। রৌদ্র কিরণে চিক চিক করিয়া হাসিতেছে নৃত্যরত ঊর্মিমালা। নাদিরা তাহা দেখিলেন। থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ঐ তো! ঐ তো আমার গুল-পরীর উড়নার অঞ্চল ভেসে যাচ্ছে। সাঁতার কাটছে।

যাই! ধরে আনিগে। ভাটিয়াল স্রোতের ঊর্মিমুখর তাইগ্রীসের বুকে নাদিরা ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। পণ্য বোঝাই একটি সওদাগরী জাহাজ শাতিল আরব ধরিয়া পারস্য উপসাগরাভিমুখে ভাসিয়া যাইতেছিল। নাবিকগণ আগেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, একজন মহিলা নদীর তীরে তীরে ভাটির দিকে কখনও হাঁটিয়া কখনও বা দৌড়াইয়া চলিয়াছে। হঠাৎ তাহারা লক্ষ্য করিলেন যে, মহিলাটি পানিতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে এবং ডুবিতেছে।

সওদাগর আল মুগিরার নির্দেশে নাবিকগণ সংজ্ঞাহীন নাদিরাকে উদ্ধার করিলেন। জড়োয়া অলংকার ভূষিতা নাদিরাকে দেখিয়া আলমুগিরা বুঝিলেন যে, মহিলা যিনিই হোন না কেন তিনি যে সম্ভ্রান্ত বংশের পুরনারী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে আল মুগিরা নাদিরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? কোথায় যাচ্ছিলেন? আর অথৈ দরিয়ায় ঝাঁপিয়েই বা পড়ছিলেন কেন?

নাদিরা বলিলেন, গুল-পরী, পরী-গুল! গুল-পরী, পরী-গুল!!

যে কোন প্রশ্নের একই উত্তর শুনিয়া সওদাগর আল মুগিরা বুঝিলেন, যে কোন কারণেই হউক মহিলার মতিভ্রম ঘটিয়াছে।

আল মুগিরা ছিলেন বাহরাইনের একজন মুসলমান সওদাগর। তিনি নাদিরাকে নিজ বাড়ীতে আনিয়া আশ্রয় দিলেন।

সকাল বেলা শুনিতে শুনিতে বাড়ীময় প্রচার হইয়া গেল যে, সম্রাজ্ঞী নাদিরা বেগমকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। সম্রাজ্ঞী দিলরাজ বানু সম্রাটের অন্যান্য স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের মধ্যে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। সম্রাট পরিবারে একি শুরু হইয়াছে!

সম্রাট ইয়াজদিগার্দের কানেও খবরটি পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। তিনি নাদিরার মহলে ছুটিয়া আসিয়া সবই শুনিলেন। তাঁহার সমস্ত রাগ যাইয়া পড়িল বাঁদীদের ও সদর দরজার দারওয়ানদের উপর। বাঁদীদের কাহাকেও বেতাইলেন, দুররা মারিলেন, কাহাকেও বা জুতাপেটা করিলেন। ঠেলিলেন তোরা কোথায় ছিলি? নাদিরা যে উঠে গেল দেখলিনে কেন?

সদর দরজার দারওয়ানদ্বয়কে দুররা মারিয়া কণ্টকিত শৃংখল পরাইয়া মালখানায় বন্দী করিলেন।

সমস্ত শহর ও শহরতলীতে খোঁজ খোঁজ সাড়া পড়িয়া গেল, কিন্তু নাদিরাকে আর পাওয়া গেল না। চতুর্দিকে খবরগীর পাঠানো হইল। কয়েক দিন পরে একজন খবরগীর আসিয়া জানাইল, শাতিল আরবের বেলাভূমিতে একটি গোলাপী রংগের উড়না পাওয়া গিয়াছে। উড়নাটি দেখিয়া সবাই চিনিল সম্রাজ্ঞী নাদিরা বেগমের উড়নাই বটে!

সম্রাট ও পরিবারের সবাই নিশ্চিত হইলেন যে, গুলবানু ও পরীবানুর শবদেহ খুঁজিতে গিয়াই নাদিরার সলিল সমাধি ঘটিয়াছে।

১৪

মার্ভ কারাগারের কারাধ্যক্ষ হঠাৎ মারা যাওয়ায় সেখানে নতুন কারাধ্যক্ষ নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত সম্রাট ইয়াজদিগার্দ শেরদিলকে মার্ভ কারাগারের অস্থায়ী কারাধ্যক্ষ নিয়োগ করিয়া পাঠাইলেন। শমশির নামে সেনাবাহিনীর সেমেটিক গোষ্ঠীর প্রধানকে অস্থায়ীভাবে মাদায়েন কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কারাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হইল।

শেরদিল মার্ভে যাওয়ার পূর্বে শাহেরবানুকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিলেন, শমশির লোকটি খুবই বদমেজাজী সম্রাটভক্ত। কারাগারের প্রকৃত অবস্থা জানতে পারলে আর রক্ষা নেই। কাজেই আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত সর্বপ্রকার দ্বীনী তালিম ও তৎপরতা বন্ধ রাখতে হবে।

শাহেরবানু প্রশ্ন করিলেন, আপনার ফিরে আসতে কত দিন বিলম্ব হতে পারে?

শেরদিল হিসাব করিয়া বলিলেন, দু-মাসের বেশী নয়

শাহেরবানু চিন্তিত হইয়া বলিলেন, যদি এরি মধ্যে কাফুর এসে যায়?

শেরদিল বলিলেন, আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। এরি মধ্যে কাফুর এসে গেলে আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত সে কারাগারে প্রবেশ করবে না, আমার বাসায় লুকিয়ে থাকবে, সেরূপ ব্যবস্থাই করে গেছি।

শাহেরবানু প্রশ্ন করিলেন, আর অন্যান্য দিক?

শেরদিল বলিলেন, অন্যান্য দিকের অবস্থা হল শমশির কারা-তালিকা পাঠ করে বিবরণ জানবে যে, আপনার বিনা শ্রমে কারাবাস। আপনার পার্শ্ববর্তী কক্ষে শাহজাদীদের পরিবর্তে অন্য দুইজন মহিলা বিনা শ্রমে বন্দিনী হয়ে আছেন। আর কাফুর নামে কোন বন্দী কারাগারে নেই। তবে বিপদ হবে সম্রাট কারা পরিদর্শনে আসলে। সব ফাঁস হয়ে যাবে। ভাগ্যিস! যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে সম্রাট এত ব্যস্ত আছেন যে, প্রায় এক বৎসর যাবত তিনি কারাগারে আসতেই পারছেন না। অথচ ব্যস্ততা এখন আরও বেড়েছে। কাজেই বিপদের আশংকা খুবই কম।

শাহেরবানু বলিলেন, আল্লাহ হাফেজ! আপনি যান।

শেরদিল সালাম করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

ভারপ্রাপ্ত কারাধ্যক্ষ শমশির। তিনি কর্মভার গ্রহণ করিয়া কৌতূহলবশে সমস্ত

বন্দীদের নামের তালিকা পরিচয় এবং অপরাধের বিবরণসমূহ পাঠ করিলেন।

তালিকায় শাহজাদীর নাম ও পরিচয় দেখিয়া শমশির বিস্মিত হইলেন। কেন? শাহজাদী শাহেরবানু কারাগারে কেন? কি অপরাধ তাও লিপিবদ্ধ নাই। অথচ দেখা যায় তিনি দীর্ঘদিন যাবত কারাগারে আছেন। কারাবাসের কারণটা কি হইতে পারে? তিনি কি চুরিরাহাজানির সাথে জড়িত? না। তাহা হইতে পারে না। তবে? তিনি কয়েকদিন ভাবিলেন, কিন্তু এই তবে-র উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। তাঁহার কৌতূহল বাড়িয়া গেল। এই তবে-র উত্তর বাহির করিবার জন্য তিনি একদিন উদ্যোগী হইয়া ধীরে ধীরে শাহেরবানুর দোরগোড়ায় আসিয়া ডাকিলেন, আসতে পারি কি শাহজাদী?

শাহেরবানু জিজ্ঞাসা করিলেন, কে আপনি?

শমশির বলিলেন, আমি ভারপ্রাপ্ত কারাধ্যক্ষ শমশির।

শাহেরবানু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। কি জানি, কিছু প্রকাশ হইয়াই পড়িল কিনা! নিজের জন্য ভাবনা নয়। যত ভাবনা গুলবানু, পরীবানু ও বন্দী মুসলমানদের জন্য। সম্রাট ইঁহাদের খবর জানিতে পারিলে হতভাগ্যদের কপালে কি হইবে কে জানে! আল্লাহ ভরসা করিয়া তিনি বলিলেন, দরজা খোলাই আছে, ভেতরে আসুন।

শমশের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। যথাসম্ভব সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া শাহেরবানু জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার কাছে আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি?

শমশির তাজিম করিয়া বলিলেন, না, তেমন কিছু নয়। শুধু একটি কৌতূহল দমন করতে না পেরে আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম।

শাহেরবানু সন্দিগ্ধ চিত্তে প্রশ্ন করিলেন, কি কৌতূহল? শমশির বলিলেন, কারাদপ্তরে আপনার কোন অপরাধের কথা উল্লেখ নেই। অথচ সম্রাট আপনাকে দীর্ঘদিন যাবত বন্দী করে রেখেছেন কেন? এটাই আমার কৌতূহল। কি অপরাধ আপনার, সেটা জানতে পারলে আপনার মুক্তির জন্য আমি সম্রাটের কাছে সুপারিশ করতে পারি

এবার শাহেরবানু হাসিয়া বলিলেন, আমার অপরাধের কথা আব্বা জানেন। এর জন্য সুপারিশ করতে গেলে আপনার অবস্থাও আমার মতই হতে পারে। শমশির বিস্ময়াহত হইয়া বলিলেন, তাই? আপনার অপরাধটি কি জানতে পারি কি?

শাহেরবানু প্রফুল্ল চিত্তে বলিলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি বলেই আব্বা আমাকে বন্দী করে রেখেছেন।

শমশের যেন আকাশ হইতে পড়িলেন! বলেন কি? আপনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ আপনি মুসলমান? আশ্চর্য! শমশির অনিমেষ নেত্রে তাকাইয়া রহিলেন শাহেরবানুর মুখের দিকে।

হ্যাঁ। শাহেরবানুর সংক্ষিপ্ত উত্তর।

শমশিরের কপালের চামড়ায় ভাঁজ পড়িয়া গেল। তিনি উর্দ্ধমুখে তাকাইয়া হাত দুইটি পিছনে ধরিয়া, নীচের ওষ্ঠটি কামড়াইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। আর অস্থিরভাবে পায়চারি করিতে লাগিলেন। আর স্বগত উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

মদীনার সেই মহানবী, শাহেন শাহে আরব। কী মধুর ব্যবহার, অমায়িক আচরণ, অকৃপণ মেহমানদারি,আর নির্ভুল পেশেনগুয়ী। উহ! কত দিনের কথা আজও মনে পড়ে। পায়চারি থামাইয়া সহসা শমশির শাহেরবানুর মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই মদীনার দ্বীনের সন্ধান আপনি মাদায়েন বসে পেলেন কেমন করে শাহজাদী?

শাহেরবানু তাঁহার দ্বীন প্রাপ্তির ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন।

সব শুনিয়া শমশির বলিলেন, আমি আপনাকে প্রথম দেখেই চিনে ফেলেছি। কিন্তু আপনি কি এখনও আমাকে চিনতে পারেন নি?

শাহেরবানু কতক্ষণ শমশিরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, কই? না তো?

শমশির বলিতে লাগিলেন, সিফিরের সঙ্গে যে কয়েকজন দূত মহানবীকে গ্রেফতার করতে মদীনায় গিয়েছিল, আমিও ছিলাম তাদের মধ্যে একজন এবং সম্রাট সকাশে মহানবীর ইতিবৃত্ত বর্ণনাকারীদের মধ্যে আমিও ছিলাম অন্যতম।

শাহেরবানু সোল্লাসে বলিলেন, হ্যাঁ, এবার চিনতে পেরেছি। আপনার বিবরণ শুনেই আমি নূরে হেরার সন্ধান পেলাম,আর আপনি এখনও অজ্ঞতার অন্ধকারেই রয়ে গেছেন?

তড়িতাহতের মত চমকিয়া আত্মবিস্মৃত কণ্ঠে শমশির বলিলেন, আমি এখনও অজ্ঞতার অন্ধকারেই আছি?

শাহেরবানু বলিলেন, হ্যাঁ, আছেন বই কি? তিনি সুললিত কণ্ঠে পাঠ করিলেন,

"আল ইসলামু হাক্কুন, ওয়াল কুফরু বাতেলুন, আল- ইসলামু নুরুল,ওয়াল কুফরু জুলমাতুন। জাআল হাক্কু ওয়া জাহাকাল বাতেলু, ইন্নাল্ বাতেনু কানা জাহুকা। "

তেলাওয়াতের সুরে অস্থির হইয়া শমশির কণ্ঠে উৎকণ্ঠা লইয়া প্রশ্ন করলেন,

আপনি যা পাঠ করলেন, এটা কার বাণী, শাহজাদী?

শাহেরবানু সহাস্যে বলিলেন, এটি মহাপ্রভুর মহাবাণী আল-কোরআন।

শমশির আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, এর অর্থ কি শাহজাদী?

শাহেরবানু অর্থ বলিতে লাগিল, "ইসলাম শ্বাশত সত্য এবং কুফুরী সর্বাংশে মিথ্যা। ইসলাম হইল স্বর্গীয় আলো এবং কুফুরী অজ্ঞানতার অন্ধকার। সত্য প্রতিভাত হইয়াছে এবং মিথ্যা চিরধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। নিশ্চয়ই মিথ্যার বিনাশ অবশ্যই চিরতরে।

সংশয়িত কণ্ঠে শমশির বলিলেন, তবে কি আমাদের খৃস্ট ধর্ম মিথ্যে?

অবশ্যই মিথ্যে। এই বলিয়া শাহেরবানু সূরায়ে মায়েদার তৃতীয় আয়াতের অংশ বিশেষ তেলাওয়াত করিলেন, "আল ইয়াও মা আকমলতু লাকুম দ্বীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নেয়ামাতী ওয়া রাজিতু লাকুমল ইসলামু দ্বীনা।"

তেলাওয়াতের সময় শমশির তৃষ্ণার্ত চাতকের মতই শাহেরবানুর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তেলাওয়াত শেষ করিয়া শাহেরবানু আয়াতটুকুর অর্থ করিয়া শুনাইলেন,

"তোমাদের মঙ্গল হেতু তোমাদের ধর্মকে আজ পূর্ণ পরিণত করিয়া দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতসমূহকে সমাপ্ত করিয়া দিলাম এবং একমাত্র ইসলামকেই তোমাদের ধর্মরূপে নির্বাচিত করিয়া দিলাম।

অর্থ বলা শেষ করিয়া শাহেরবানু বলিলেন, এবার নিশ্চই বুঝতে পেরেছেন যে, ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্ম রহিত হয়ে গেল।

বিভ্রান্তের মত অসহায় কণ্ঠে শমশির প্রশ্ন করিলেন, আমাদের যিশু ও মরিয়ম সমন্ধে কোন বাণী ইসলামে আছে কি?

শাহেরবানু উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, আমাদের ধর্মগ্রন্থ আল কোরআনের বহু জায়গায় হযরত ঈসা (আঃ) বা যিশু ও বিবি মরিয়ম সম্বন্ধে অনেক বর্ণনা রয়েছে। এই বলিয়া শাহেরবানু সূরায়ে আলে ইমরানের ৪২ নং হইতে ৪৮ নং আয়াত পর্যন্ত সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত করিলেন।

তেলায়াতের প্রতিটি শব্দ শমশিরের কর্ণে মধু বর্ষণ করিতে লাগিল, আর যুগযুগান্তরের কুফুরীর অন্ধকারে পরিপূর্ণ হৃদয় মন্দিরের কুসংস্কারের বন্ধ কপাটে আঘাত হানিতে লাগিল, আর খুলিতে লাগিল অধর্মের জং ধরা অর্গল। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে প্রবেশ করিতে লাগিল নূরে হেরার বন্যা। শমশির হইয়া উঠিতে লাগিলেন মণিহারা ফণীর মত উদভ্রান্ত, দিশাহারা চঞ্চল। শাহেরবানু বলিতে লাগিলেন, হে মরিয়ম, নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা তোমাকে বিশ্ব জগতের নারীগণের উপরে মনোনীত করিতেছেন, পবিত্র করিতেছেন এবং নির্বাচিত করিতেছেন। (৪২) হে মরিয়ম, স্বীয় প্রতিপালকের আনুগত্য করিতে থাক এবং রুকুকারীদের

সাথে রুকু ও ছেজদা করিতে থাক (৪৩) এই ইতিবৃত্ত গায়েবী সংবাদসমূহের অন্যতম। আমি তোমার নিকট ইহার প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিতেছি। তাহাদের মধ্যে কে মরিয়মকে প্রতিপালন করিবে এই উদ্দেশ্যে যখন তাহারা কোরআন ঢালিতেছিল এবং ঝগড়া করিতেছিল তখন তুমি তাহাদের নিকট ছিলে না। (৪৪) যখন ফেরেস্তাগণ বলিল. হে মরিয়ম নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাঁহার পক্ষ হইতে কালেমার দ্বারা একটি সুসংবাদ দান করিতেছেন. তাহার নাম হইবে ঈসা বিন মরিয়ম। সে ইহকালে ও পরকালে সম্মানিত হইবে এবং সান্নিধ্য প্রাপ্তিগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে। (৪৫) সে মানুষের সহিত কথা বলিবে দোলনার মধ্যে এবং পরিপূর্ণ বয়সে. আর সে হইবে নেককারদের দলভুক্ত। (৪৬) মরিয়ম বলিল. হে আমার প্রভু. কিরূপে আমার সন্তান হইবে? অথচ কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই। আল্লাহ বলেন. এইরূপেই হইবে. আল্লাহ যাহা করেন সৃষ্টি করিয়া দেন। যখন কোন কার্য করিতে ইচ্ছা করেন তখন উহাকে বলেন. হইয়া যাও. ফলত উহা হইয়া যায়। (৪৭) আর আল্লাহ তাঁহাকে শিক্ষা দিলেন জ্ঞানগর্ভ কথা. কিতাব এবং তাওরাত ও ইঞ্জিল। (৪৮)

অর্থ বলা শেষ হইলে শমশির অভিভূতের মত বলিতে লাগিলেন. বিবি মরিয়ম ও হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে এমন সুস্পষ্ট ও নির্ভুল উক্তি. আমাদের ইঞ্জিলেও নেই। কী অদ্ভুত! কোন পক্ষপাত নেই. নেই কোন অতিশয়োক্তি

শাহেরবানু বলিলেন. অথচ আপনারা মরিয়মের পুত্র ঈসাকে আল্লাহর পুত্র বলে আখ্যায়িত করেন। বলুন তো? এতে কি বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহকে আপনারা পরস্ত্রীগামী করে ছাড়েন নি? নাউজুবিল্লাহ! অথচ তিনি "লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ"।

অর্থাৎ বিশ্বপ্রভু আল্লাহ কাহারো ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন নাই এবং কাহাকেও জন্ম দেনও নাই।

মরুভূমিতে সর্বস্ব লুণ্ঠিত নিঃস্ব পথহারা তৃষ্ণার্ত পথিক যেমন পানির সন্ধান পাইলে পাগলের মত বাহ্য জ্ঞান হারাইয়া অঞ্জলি ভরিয়া পানি মুখে তুলিয়া নিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়ে. শাহেরবানুর কথা শুনিয়া শমশির তেমনি স্থান-কাল ভুলিয়া বুক চাপড়াইয়া চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন. আমাকে সত্যের সন্ধান দিন শাহজাদী. আমাকে মিথ্যার পংক হতে উদ্ধার করুন। মহানবীকে স্বচক্ষে দেখেও চিনতে পারিনি. খসরু হত্যার সংবাদ স্বকর্ণে শুনেও বুঝতে পারিনি। শত ধিক্ আমাকে! আর আপনি আমার কাছে শুনেই চিনেছেন! পেয়েছেন আলোর সন্ধান। ধন্য ভাই সিফির! ধন্য শাহ্জাদী! এই কথা বলিয়াই শমশির উম্মাদের মত নিজের চোখের উপর কর্ণের উপর মুষ্টাঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন. কেন চিনতে পারলে না. কেন বুঝতে পারলে না. তোদেরকে আমি আর সক্রিয় রাখব না ইত্যাদি।

শাহেরবানু বলিলেন. আপনি নিরস্ত হোন কারাধ্যক্ষ. আপনি পড়ুন.

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ।"

শমশির আত্মস্থ হইলেন এবং কালেমায়ে তৈয়ব ও কালেমায়ে শাহাদৎ পাঠ করিয়া ধন্য হইলেন।

মরুভূমিতে পথহারা তৃষ্ণার্ত পথিক পাইল শীতল বারিধারা, অধর্মের অন্ধকারে নিমজ্জিত জন পাইল নূরে ইসলাম। উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল শমশিরের প্রাণ।

শমশির দিনে রাতে সময়ে অসময়ে শাহেরবানুর কাছে আসিয়া দ্বীন ও কোরআন শিখিতে লাগিলেন। শাহেরবানু যখন শমশিরকে জানাইলেন যে, শেরদিলসহ কারাগারের অধিকাংশ কর্মচারী ও বন্দী মুসলমান হইয়া গিয়াছে তখন তাঁহার বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রহিল না। কারাগারের প্রকৃত বিবরণ অবগত হইয়া শমশির আবার তালিমের জামাত শুরু করাইয়া দিলেন।

যথাসময়ে শেরদিল আসিয়া কার্যভার গ্রহণ করিলেন এবং শমশিরের পরিবর্তন দেখিয়া শুনিয়া যারপরনাই খুশী হইয়া আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করিলেন। শমশির শাহেরবানুর নিকট বিদায় লইতে আসিয়া বলিলেন, আমি যে কিছুই শিখতে পারিনি শাহজাদী। আমার দ্বীন শেখার উপায় কি এবং করণীয় কি?

শাহেরবানু শেরদিলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শমশিরকে বলিয়া দিলেন, আপনার জন্য কারা ফটক সর্বদাই উন্মুক্ত। আপনার অবসরমত এসে তালিম নিয়ে যাবেন এবং আপনার সাধ্যানুসারে ইসলাম প্রচার করতে সচেষ্ট হবেন।

বলা বাহুল্য শমশির প্রায়ই শাহেরবানুর কাছে আসিতেন এবং প্রয়োজনীয় তালিম নিয়া যাইতেন। মাঝে মধ্যেই দুই চারিজন অনুগত লোক লইয়া আসিতেও প্রয়াসী হইতেন। ইহাদের সবাই শাহেরবানুর অমিয় বাণী শ্রবণ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করত ধন্য হইয়া যাইত। এই প্রক্রিয়ায় অল্প দিনের মধ্যেই সেনাবাহিনীর সেমেটিক সৈন্যগোষ্ঠীর সবাই মুসলমান হইয়া গেল এবং কারাগার হইল তালিমের কেন্দ্র।

ইয়াজদিগার্দের মাদায়েনের কারাগার হইল মদীনার ইসলামাগার। শাহেরবানু শমশিরকে বলিয়া রাখিলেন সুযোগ পাইলে তিনি যেন ইসলামের জন্য জেহাদ করেন।

১৫

প্রায় এক বৎসরকাল অতিবাহিত হইতে চলিয়াছে, কাফুর মদীনার পথে মাদায়েন ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরিয়া আসিতেছে না কেন, এই দুশ্চিন্তায় শাহেরবানুর মনের শান্তি চোখের ঘুম তিরোহিত হইল। সে নাকি পদব্রজে মদীনার পথ ধরিয়াছিল। এতদিনেও কি তাঁহার যাওয়া আসা শেষ হয় নাই? এমনি কত কি ভাবেন শাহেরবানু! কাহার কাছে খবর লইবেন আর কাহাকেই বা পাঠাইবেন? কাফুর কি মদীনায় পৌছিতে পারে নাই? নাকি পথিমধ্যেই বিনষ্ট হইল, কে জানে। যদি পৌছিয়া থাকে তবে কি হযরত হোসাইন (রাঃ)-কে কাফুর পাইয়াছে? পাইয়া থাকিলে তাঁহার উপহার কি গ্রহণ করিয়াছেন? যদি সবই না-মঞ্জুর হইয়া থাকে?

শাহেরবানু যেন আর ভাবিতে পারেন না। আশার শৈলচূড়া হইতে নিরাশার অতল গহ্বরে নিপতিত হইয়া হাবুডুবু খাইয়া মরিতেছেন। কিছুতেই যেন খেই পাইতেছেন না! তবে কি এমনিভাবে আল্লাহ তাঁহাকে বঞ্চিত করিবেন। হে আল্লাহ! মানুষের মনে যে এশকের আগুন, ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় তাহাও তো তোমারই দান। মানুষতো আর এইসব হইতে মুক্ত নয়। শাহেরবানু আবৃত্তি করেন,

"আয় খোদা ই, দরকালামে, তুগুফতী!

জুইয়েনা লীন, নাছে হুব্‌বুশ্, শাহওয়াতী!!

হে আল্লাহ, তুমিইতো কালামে পাকে ঘোষণা করিয়াছ, স্ত্রী পুরুষকে পরস্পরের ভালবাসার অলংকার দিয়াই সৌন্দর্যমন্ডিত করা হইয়াছে।

ই কানিজাক, আতশে আ, সুজ বসুজ!

রফতা, রফতা, দরগোরুস্তাঁ, রোজ বরোজ!!

এই দাসী সেই আগুনে জ্বলিয়া পড়িয়া প্রতিদিনই ধীরে ধীরে গোরস্থানের যাত্রী হইতেছে।

"গারহামীমুর; দাবাশাম আয়, ইঁ খবর!

নজদে ওরা; ছাদকে মাশুক; দর কবর!!

হে আল্লাহ! আমি যদি মরিয়াই যাই, তবে এই খবরটি তাঁহার কাছে পৌছাইও যে, প্রেমিকা কবরে আছে।

তালিমের ও এবাদত বন্দেগীর ফাঁকে ফাঁকে এমনিভাবে গজল রচনা করিয়া শাহেরবানু মনের খেদ দূরীকরণের চেষ্টা করিতেন।

একদা গভীর রাত্রে শাহেরবানুর কক্ষে তালিম চলিতেছিল। তিনি কাহারো মুখস্থ সূরা শুনিতেছেন, কাহাকেও নতুন সূরা বলিয়া দিতেছেন, কাহাকেও বা নামাযের বিভিন্ন দোয়া বলিয়া দিতেছেন। সহসা তাহার দরজার উপর আংগুল ঠোকার পরিচিত সংকেত শোনা গেল। শাহেরবানুর ইশারায় একজন দরজা খুলিয়া দিলে কক্ষে প্রবেশ করিলেন শেরদিল। তিনি নিম্নস্বরে শাহেরবানুর কানের কাছে কি যেন বলিলেন!

শাহেরবানুর ইংগিতে সবাই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। শেরদিলও বাহির হইয়া গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা ঠেলিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল কাফুর। সে শাহেরবানুকে সালাম করিয়া দরজাটি ভেজাইয়া দিয়া অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

শাহজাদীর মুখে অস্ফুট বিস্ময়ের শব্দ, কাফুর?

কাফুর করজোড় হইল, গোস্তাকি মাফ হয় আম্মি?

শাহেরবানু কাফুরের সালামের জবাব দিয়া বলিলেন, তুমি বস কাফুর। কাফুর দরজার কাছে মেজের উপর বসিয়া পড়িল।

শাহেরবানু বলিলেন, এবার তোমার ভ্রমণ কাহিনী বলে যাও।

মাদায়েন হইতে মদীনা যাওয়ার পথে পথিমধ্যে তস্করের হাতে পড়া, দৈবক্রমে উদ্ধার, খালিদ বিন ওলিদের সাথে পরিচয়, জেহাদে অংশ গ্রহণ, সেনাপতি মুসান্নার সাথে মদীনায় গমন, হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর মৃত্যু, হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত লাভ, হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর জন্য মদীনায় অবস্থান, কাফুর একে একে সবই বর্ণনা করিল।

কোথায় কিভাবে হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর সঙ্গে তাহার দেখা হইল, কিভাবে পরিচয় হইল, কিভাবে কি কি কথাবার্তা হইল এবং হাদীয়া পেশ করার পরে তিনি কি বলিলেন, শাহজাদীর প্রতি তাঁহার কি নির্দেশ, বন্দীদের মুক্তির উপায়ও তিনি করিবেন এই সবই কাফুর বিস্তারিতভাবে বলিল।

শাহেরবানু রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনিয়া যাইতেছেন কাফুরের কথা, আর মনে খেলিয়া যাইতেছে অনাবিল পুলক শিহরণের এক মধুর ঢেউ। তিনি ভাবিতেছেন, তাহা হইলে তাঁহার ভাগ্য কি সুপ্রসন্ন? আল্লাহ কি তাঁহার ফরিয়াদ শুনিয়াছেন?

সর্বশেষ কাফুর বলিল, তিনি আপনাকে সালাম জানিয়েছেন।

শাহেরবানু সালাম গ্রহণ করিলেন।

বস্ত্রাঞ্চল হইতে কাফুর হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর আমামা ও পাদুকার পুটুলিটি বাহির করিয়া শাহেরবানুর সম্মুখে তুলিয়া ধরিল।

শাহেরবানু বিস্ময়মাখা কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, এসব কি? কি আছে এর মধ্যে?

কাফুর বিনম্রভাবে বলিল, এগুলি তিনি আপনাকে প্রতিদান দিয়াছেন। কাফুর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

শাহেরবানু কম্পিত হস্তে পুটলিটি খুলিয়া আঁতকাইয়া উঠিলেন, শিরের আমামা! পায়ের পাদুকা! আলহামদু লিল্লাহ! তিনি পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে আমামা ও পাদুকা প্রথমে বুকে, তারপর চুমো খাইয়া মস্তকে ধারণ করিলেন।

তিনি ভাবিতেছেন, আমি যেমন তাঁহার কথা কল্পনা করি তিনিও কি তেমনি আমার কথা কল্পনা করেন? নিশ্চয়ই। তাহা না হইলে আমামা আর পাদুকা পাঠাইতেন না।

অকারণ পুলকে শাহেরবানুর মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠে, অহেতুক লজ্জায় চোখ অবনত হইয়া যায়! ইহারই নাম কি এশক?

শাহেরবানু ভাবেন, সার্থক হইয়াছে তাঁহার মানব জীবন, সার্থক হইয়াছে তাঁহার কারাবরণ। বেহেস্তের যুবকদের সরদার সৈয়দকুল শিরোমণি হযরত হোসাইন (রাঃ) বলিয়া দিয়াছেন, তাঁহার সকল আশাই আল্লাহ পূরণ করিতে পারেন।। ইহার চেয়ে বড় দোয়া তাঁহার জন্য আর কি হইতে পারে!

তিনি আমামাটি লইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই আমামা শোভা পাইত মহামতি হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর শির মোবারকে। আর এই পাদুকাদ্বয় শোভা পাইত তাঁহার পদকুকনদে। শিরের আমামা আর পায়ের পাদুকা। এই দুইয়ের মাঝখানে আছেন তিনি।.....আর আমি....?

শাহেরবানু আনন্দাশ্রুতে বিগলিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,

'দিস্তারেই' দৌলতেমন্দ; আঁশির আস্ত!

রোজে মাহ্‌শার, আঁকে শির-ব; লন্দে রাস্ত!!

এই পাগড়ী ঐ সৌভাগ্যশীল মস্তকে ছিল, যে মস্তকটি হাশরের মাঠে সবার উপরে উন্নীত থাকিবে।

'পয়জারে ইঁ-দৌ; লতমন্দআঁক; দম বুয়াদ!

যাঁকে খেদমত; বেহেস্ত-হা; ছেল বুয়াদ!!

এই পবিত্র পাদুকা এমন এক ভাগ্যবান চরণে ছিল যে চরণ সেবা করিলে বেহেস্ত লাভ হইবে।

'আঁদু চীজ্‌রা; তুদাদীমান; কেরদেগার!

যাঁকে রানা; দানাতভুজা; হাঁ দিগার!!

হে প্রভু! এমন দুইটি বস্তুই তুমি আমাকে দান করিয়াছ, যাহা পৃথিবীর

দ্বিতীয় আর কাহাকেও দান কর নাই।

'আয় খোদা ইঁ: গেদারাতু: গান্‌জে দাদ!

বা হুজুরে: শুকরে কারদাম: সাদও বাদ!!

আয় আল্লাহ! এই নিম্ন ভিখারীকে তুমি গুপ্ত ভাণ্ডার দান করিয়াছ। আনন্দে আত্মহারা হইয়া তোমার দরবারে কৃতজ্ঞতা আদায় করিতেছি।

শাহেরবানু এই রাত্রেই অতিরিক্ত তিন শত রাকাত নামাজ আদায় করিলেন এবং পরবর্তী এক সপ্তাহ নফল রোজা রাখিলেন।

১৬

কারাধ্যক্ষ শেরদিলের নির্দেশক্রমে ঐদিনই কারা চিকিৎসক গুল ও পরীবানুর চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন। চিকিৎসকও ইতিপূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিও সাধ্যানুযায়ী ত্বরিত নিরাময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই ভগ্নিদ্বয় সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। যাহাতে তাঁহাদের দ্বীনী তালিমের সুবিধা হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সকলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শাহেরবানুর পার্শ্ববর্তী কক্ষেই গুল ও পরীবানুকে থাকার ব্যবস্থা করা হইল। সাধারণ বন্দীরা জানিল যে, দুইজন মহিলা সম্রাটের কোপানলে পড়িয়া কারাগারে আসিয়াছে।

এই ব্যবস্থা প্রেক্ষিতে গুল ও পরীবানু আনন্দে আত্মহারা! যম কঠুরীতে বন্দী হইয়া জল্লাদের তরবারির নীচ হইতে বাঁচিয়া গিয়া কারাগারে শাহেরবানুর কাছে দুই ভগ্নির ইসলাম শিক্ষা করার পরিকল্পনাটির সুযোগ যে এইভাবে তাঁহাদের জীবনে আসিবে তাহা কি তাঁহারা জানিতেন? এই সমস্তই যে মহাপ্রভুর অসীম অনুগ্রহ! তাঁহারা ইহার জন্য অষ্ট প্রহর আল্লাহর শুকুরিয়া আদায় করেন।

একেতো গুলবানু ও পরীবানু আগে হইতেই শাহেরবানুকে অত্যধিক ভালবাসিতেন, তদুপরি এখন নিবিড়ভাবে পরস্পরকে কাছে পাইয়া তিন বোনের সে কী আনন্দ! কতই তাঁহাদের হাস্য-লাস্য, কতই তাঁহাদের হৃদ্যতা যেন ত্রিরত্নের সমাহার!

কারাগার শুধু তাঁহাদের জন্য নামেই কারাগার হইল। আসলে সর্বপ্রকার সুখ ভোগের সুবিধা এবং তালিমের সুযোগ অন্য বন্দীদের চাইতেও তাঁহাদের অনেক বেশী। ফলে তাঁহারা শাহেরবানুর নিরলস প্রচেষ্টায় ও নিজেদের ঐকান্তিক আগ্রহে অল্পদিনেই শিখিলেন অনেক। তবু গুল ও পরীবানুর আফসোস, তাঁহারা শাহেরবানুর সমান শিখিতে পারে নাই।

গুলবানু ও পরীবানু কেবল ভাবেন, আমরা যেহেতু অনেক বিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি, কাজেই আমাদের বিগত জীবনের গোনাহ এখনও বলবৎ আছে সেইগুলি আল্লাহ পাক ক্ষমা করিবেন কি? যদি ক্ষমা না করেন তাহা হইলে উপায়? দুর্ভাবনায় তাঁহারা অস্থির হইয়া এই ব্যাপারে শাহেরবানুকে প্রশ্ন করিলেন। তনি ভগ্নিদ্বয়কে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,

"গুফতে খোদা; বান্দা আঁকে আছরাফু!

রহমতে আজ; খোদায়ে লা, তাকনাতু!!

আল্লাহ বলেন, যেসব বান্দা নিজেদের উপর অতিরিক্ত পাপের অত্যাচার করিয়াছে, তাহারা যেন আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ না হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন।

'দর হাদীছে; আমদ আঁকে; বান্দা চুঁ!

লা ইলাহা; ইল্লাল্লাহু. গুফতে গু!!

"হাদীস শরীফে এরশাদ হইয়াছে যে, বান্দা যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এই কালেমা বলে এবং আলোচনা করে,

'গোনা+হাম্মা; বসুজাদবান, দাবুয়াদ!

সদ ছালেহা; মাজুছীতিফ; লে বুয়াদ!!

তখন সমস্ত পাপ জ্বলিয়া পুড়িয়া যায় এবং এক শত বৎসরের অগ্নি-উপাসক হইলেও বান্দা একটি শিশুর মত নিষ্পাপ হইয়া যায়।

এই কথা শুনিয়া গুল ও পরীবানুর মুখে হাসি ফুটিল। তাঁহারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

বেশ কিছুদিন পরের কথা। একদিন ঘটিল এক মজার ঘটনা। শাহেরবানু গিয়াছেন হাম্মামে গোছল করিতে। ইত্যবসরে কি একটা প্রয়োজনে পরীবানু শাহেরবানুর কক্ষে আসিয়া এইটা সেইটা নাড়িতে নাড়িতে কতগুলি কাপড়ের নীচ হইতে হযরত হোসাইন (রাঃ)-র আমামা ও পাদুকা আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। তিনি কিছু বুঝিতে না পারিয়া গুলবানুকে ডাকিয়া আনিয়া সব দেখাইলেন।

দুই ভগ্নি বিস্ময়ে হতবাক! শাহেরবানুর কক্ষে পুরুষ লোকের আমামা ও পাদুকা আসিল কোথা হইতে? এই প্রশ্ন লইয়া তাঁহারা তর্ক করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন মীমাংসায় পৌঁছিতে পারিলেন না।

গুলবানু বলিলেন, নিশ্চয়ই এগুলো কারাধ্যক্ষের পাদুকা হইবে।

পরীবানু প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, তা কখনও নয়। দীস্তারও কি তবে কারাধ্যক্ষের হবে বলতে চাও?

গুলবানু বলিলেন, ধরেন, দীস্তারও কারাধ্যক্ষেরই। কারণ তিনি শাহেরবানুকে খুবই ভক্তি, শ্রদ্ধা করেন এবং মাদর বলে ডাকেন।

পরীবানু একটু ভাবিয়া বলিলেন. কিন্তু তাতে তো তাঁর দীস্তার ও পাদুকা শাহেরবানুর কক্ষে থাকার কথা নয়।

গুলবানু পাদুকাদ্বয় ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে বলিলেন, তবে কোন ছাত্রের হবে। তালিম নিতে এসে ভুলে ফেলে গেছে।

পরীবানু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, উহু! তাও নয়। ভুলে ফেলে গেলে খুঁজে নিয়ে যেত।

গুলবানু আমামা দেখিতে দেখিতে বলিলেন. তা বটে! তবে তোর কি মনে হয়! কার হতে পারে?

পরীবানু জোর দিয়া বলিলেন. নিশ্চয় কোন মাশুকের হবে। তা না হলে

নিজের ওড়না দিয়ে পায়ের পাদুকা আর দীস্তার এমন করে কেউ যত্ন করে ঢেকে রাখে?

গুলবানু পরীবানুর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, তবে মাশুকটি কে?

পরীবানু ভাবিত হইয়া বলিলেন, তাই তো কথা! এ কারাগারে কার সাথে শাহেরবানু গোপন যোগাযোগ থাকতে পারে?

গুলবানু একটু ভাবিয়া বলিলেন, বাইরেরও কেউ হতে পারে তো?

পরীবানু প্রতিবাদ সুরে বলিলেন, বাইরের কে আবার কারাগারে আসার সুযোগ পাবে?

গুলবানু দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, কেন? অসম্ভব কি? দেখছিস্ না, কারাগারটাই এখন শাহেরবানুর নিয়ন্ত্রণে বলা চলে। দৈনিক কত লোক তাঁর কাছে আসে, তালিম নেয়, কাজেই বাইরের কেউ এসে তাঁর সাথে আসা যাওয়া করবে, তাতে আর বিচিত্র কি?

গুলবানুর কথা পরীবানুর তেমন মনঃপূত হইল না। তাই তিনি বলিলেন, কেন? মাশুক তো কারাগারের কেউ হতে পারে?

গুলবানু জোর প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, অসম্ভব! শাহেরবানু এত নীচে নামতে পারে না। পরী, সে একজন শাহজাদী। আর কারাগারে সব খুনে ডাকাতে বন্দী। এদের সাথে শাহেরবানুর আশনাই হতে পারে না।

এমনি সব কথোপকথন করিতে করিতে দুই সহোদরা আমামা ও পাদুকা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিলেন। গোছল সমাপ্ত করিয়া শাহেরবানু এমন সময় হঠাৎ কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং গুলবানুর শেষ কথাটি শুনিয়া ফেলিলেন। ভগ্নিদের কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া তিনি লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিলেন। তিনি ছুটিয়া পালাইবেন নাকি কোথাও যাইয়া লুকাইবেন, তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। হায়রে লজ্জা, এমন গোপনও প্রকাশ পায়? তাঁহার বুকে দুরু দুরু শব্দ।

গুলবানু জিজ্ঞাসা করিলেন, এসব কিরে, শাহেরবানু?

এতক্ষণে শাহেরবানু কিছুটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। তিনি যথাসম্ভব স্বস্তি সহকারে বলিলেন, কিছু না। কিন্তু তাঁহার কণ্ঠের আড়ষ্টতা গুল ও পরীবানুর কাছে গোপন রহিল না।

গুলবানু শাহেরবানুর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "কিছু না" বললেই কি জিনিসগুলি কিছু না হয়ে যাবে? নাকি হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে, বল না? এ সব কি?

এইবার নিজকে সামলাইয়া লইয়া শাহেরবানু বলিলেন, দেখতেই তো পাচ্ছ আপা! একটি দীস্তার আর দু'পাটি পাদুকা। এই বলিয়াই শাহেরবানু জিনিসগুলি হস্তগত করিবার জন্য ছোঁ মারিলেন।

ছোঁ মারিলেন বটে! কিন্তু হস্তগত করিতে পারিলেন না। কারণ ততোধিক ত্বরিৎ গতিতে শাঁ করিয়া গুলবানু পাদুকা এবং পরীবানু আমামা নিজ নিজ দখলে নিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

শাহেরবানু আবার হাত বাড়াইয়া বলিলেন, দাও আপামণি, চাপিয়ে নষ্ট করে ফেললে যে! ভোমরা ভারী ইয়ে!

পরীবানু বলিলেন, ইয়ে হই! আর টিয়ে হই! দেব না, আগে বল এগুলো কার ;

শাহেরবানু বলিলেন, আগে দাও, পরে বলব।

গুলবানু বলিলেন, আগে বল, তারপর দেব।

শাহেরবানু দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, না! বলব না।

গুল ও পরীবানু একযোগে উত্তর দিলেন, তবে দেব না। এই দিলুম চাপ দিয়ে নষ্ট করে। এই বলিয়া দুই ভগ্নি আমামা ও পাদুকা চাপিবার ভান করিলেন।

শাহেরবানু বলিলেন, তোমরা ভারী দুষ্টু।

পরীবানু বলিলেন, আহারে! আমার শিষ্ট! ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস। মাশুক যোগাড় করে ফেলছিস নিশ্চয়। কখন জানি এসে দীস্তার আর পয়জার ফেলে গেছে। হাঁরে! বল না, মাশুকটি কে?

পরীবানুর শেষ কথায় শাহেরবানুর কপোলদ্বয় লাজ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, মাশুক না ছাই, বললেই হল।

গুলবানু শাহেরবানুর লাজ-রক্তিম মুখ দেখিয়া তাঁহাকে কোলে টানিয়া নিয়া কপোল টিপিয়া দিয়া বলিলেন, আর লুকুস নে শাহেরবানু! তুই ধরা পড়ে গেছিস্। প্রিয়জনের জিনিস না হলে কি কেউ ওড়না দিয়ে এমন যত্ন করে বেঁধে রাখে? বল, এগুলো কোন্ ভাগ্যবানের।

এইবার শাহেরবানুর কথা বন্ধ হইয়া গেল। চোখে দেখা দিল অশ্রু।

গুলবানু নিজ অঞ্চল দিয়া শাহেরবানুর অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, কাঁদিস নে বোন। আমরা কি তোর অমঙ্গল চাই? আমাদের কথায় ব্যথা পাবি, তা জানলে কি আর ইয়ার্কি করতাম? এই নে তোর জিনিস। এই বলিয়া তিনি পাদুকাদ্বয় শাহেরবানুর কোলের উপর রাখিয়া দিলেন।

পরীবানুও আমামা ফেরৎ দিয়া বলিলেন, আমরা বন্দী। আমাদের কি আর সেই শাহজাদীর মর্যাদা আছেরে শাহের? শাহজাদা কি কেউ জুটবে? কোথায় ডুবেছিস, কে জানে, পরীবানুর চোখও আর্দ্র হইয়া উঠিল।

গুলবানু শাহেরবানুর কেশ বিন্যাস করিতে করিতে বলিলেন, লোকটি দেখতে কেমন রে? মানাবে তো?

শাহেরবানু গুলবানুর কোলে মুখ লুকাইয়া বলিলেন, আমি কোনদিন তাঁকে দেখিনি। আপামণি, তিনিও আমাকে কোনদিন দেখেন নি। কাজেই মানামানির কি বুঝব?

ভগ্নিদ্বয় যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিস্ কিরে? দেখাদেখি হয়নি! তবে যে বড় মন দেয়া নেয়া হল দেখি!

গুলবানুর কোলে মুখ রাখিয়াই বলিলেন, তা কিছুটা হল বৈ কি?

পরীবানু বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, শুধু কি আদানই হল? নাকি প্রদানও করেছিস কিছু?

শাহেরবানু পিট্ পিট্ করিয়া পরীবানুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, হাঁ কিছু করেছি বটে!

পরীবানু আগ্রহ সহকারে প্রশ্ন করিলেন, কি দিয়েছিস?

শাহেরবানু টানিয়া টানিয়া বলিলেন, আমার সবগুলো অলংকার।

দুই ভগ্নির কণ্ঠেই অবিশ্বাসের সুর! সবগুলো অলংকার দিয়ে ফেললি?

শাহেরবানুর সংক্ষিপ্ত উত্তর, হাঁ।

গুলবানু বলিলেন, ঐ দিন না তুই আমার প্রশ্নের উত্তরে বললি, অলংকারগুলো অন্য জায়গায় রেখেছিস্?

শাহেরবানু লজ্জিত কণ্ঠে বলিলেন, ঐ তো! ঐ জায়গাতেই।

পরীবানু বলিলেন, কি সব আজগুবী কথা বলছিস? দেখাদেখি নেই। অথচ সব দিয়ে ফেললি। এও কি বিশ্বেস করতে হবে? এবার বল না শুনি, লোকটি কে?

শাহেরবানু ঘাড় নীচু করিয়া বলিলেন, তিনি ছারওয়ারে কায়েনাত, নবীয়ে দু-জাহান, শাফীউল মুজনেবীন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর নয়নের নিধি খাতুনে জান্নাত বিবি মা ফাতেমার নয়নমণি বেহেস্তের যুবকদের সর্দার হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)। এ দীস্তার তাঁরই পবিত্র মস্তকের শোভা বর্ধন করত, আর এ পাদুকাদ্বয় তাঁরই পবিত্র পদ যুগলের শোভা বর্ধন করত। দয়া করে এ দাসীকে উপহার পাঠিয়েছেন।

এই কথাগুলি বলিয়া শাহেরবানু লাজ-রক্তিম হইয়া পরীবানুর কোলে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন।

বিস্ময়ে হতবাক ভগ্নিদ্বয়ের মুখে কোন কথা ফুটিল না। উভয়ে শাহেরবানুর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। বিস্ময়ের ঘোর কাটিলে গুলবানু বলিলেন, কারাগারে বন্দী থাকতে থাকতে তোর কি মতিভ্রম ঘটেছে?

শাহেরবানু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, তা হবে কেন?

গুলবানু শাহেরবানুকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, তবে এসব বলছিস কি? এ যে পাগলের প্রলাপ! তোর কথা কি কেউ বিশ্বেস করবে?

শাহেরবানু সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, কেউ বিশ্বাস করুক আর না-ই করুক আপা, যা বলছি তার একটি বর্ণও মিথ্যে নয়।

পরীবানু শাহেরবানুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, কি করে তা হল বল তো শুনি।

সিফিরের মুখে শোনা নানা-নাতীনের কাহিনী হইতে বর্তমান পর্যন্ত হযরত হোসাইন (রাঃ) সম্বন্ধে শাহেরবানু তাঁহার নিজের চিন্তা-ভাবনা ও কার্যক্রমের সমস্ত কথাই অকপটে ভগ্নিদের কাছে বর্ণনা করিলেন।

সব শুনিয়া গুলবানু বলিলেন, তুই সৌভাগ্যশালিনী তাতে কোন সন্দেহ নেই। যাঁর কারণে বিশ্ব নিখিল সৃষ্টি, যাঁর কারণে দ্বীন ইসলাম আজ প্রতিষ্ঠিত, সেই কারণের সমস্ত সত্বাই আজ তোর হাতের মুঠোয় আসতে যাচ্ছে। তুই সামান্য একজন নারী হয়ে যে ইতিহাস সৃষ্টি করতে যাচ্ছিস্ পৃথিবীর আর কোন নারীর পক্ষেই তো তা হয়ে উঠল না। শুধু যে তুই মাদায়েনের কারাগারে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছিস, সম্রাটের সেনাব্যাহিনীতে দ্বীন প্রচার করেছিস তা নয়, তুই চলেছিস নবী পরিবারের সদস্যা হতে, মহানবীর আওলাদ সৈয়দকুলের প্রবাণ সহায়ক হতে। তোর মত ভাগ্যবতী রমণী বিশ্বে আর কে আছেরে শাহের?

পরীবানু শাহেরবানুকে আপন কোলে টানিয়া লইয়া বলিলেন, তোর সৌভাগ্য দেখে হিংসে হয়রে শাহের! ধন্য তোর প্রেম, ধন্য তোর বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটিকে না দেখেও তাঁর মন জয় করার প্রেম সাধনা। সুদূর আকাশে বসে চন্দ্র যেমন পৃথিবীর মহাসাগরের জলরাশিকে আকর্ষণ করে, জোয়ার সৃষ্টি করে, তেমনি তুই মাদায়েনের কারগারে বসে সুদূর মদীনার দুলালের মনে ভালবাসার জোয়ার বয়ে দিয়ে আকর্ষণ করেছিস্। এ কি কম কথা!

গুলবানু বলিলেন, তুই আমাদের গৌরব, তোর গৌরবে আমরাও গৌরবান্বিত।

পরীবানু বলিলেন, সত্যি! তুই আমাদের ছেড়ে চলে যাবি?

শাহেরবানু ভগ্নিদের হস্ত চুম্বন করিয়া বলিলেন, আল্লাহ যদি আমাকে মদীনা যাবার তৌফিক দেন তবে কথা দিলাম, তোমাদের না নিয়ে আমি মদীনায় যাব না, ইনশাআল্লাহ!

পরীবানু বলিলেন, আমাদের নিয়ে তুই কি করবি শাহেরবানু?

শাহেরবানু হাসিয়া বলিলেন, আমি নই। আল্লাহ যা করেন।

গুলবানু বলিলেন, হযরত হোসাইন (রাঃ) কিভাবে বন্দীদের উদ্ধার করবেন?

শাহেরবানু বলিলেন, তা আমি এখনও জানিনে।

তবে উদ্ধারের ব্যবস্থা যে করবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তোমরা নিশ্চিত থাকো।

জোহরের নামাজের সময় আসন্ন হওয়ায় তাঁহারা উঠিয়া গেলেন।

১৭

বুয়ায়েবের যুদ্ধে ইয়াজদির্গাদ বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজয় করিয়া সেনাপতি মহাবীর মুসান্না ইন্তেকাল করিলেন।

খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) সাদ বিন আবি ওয়াককাছকে পূর্বাঞ্চলীয় রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করিয়া পাঠাইলেন বটে, কিন্তু সিরীয় সীমান্তে গোলযোগ বাড়িয়া যাওয়ায় শুধু আত্মরক্ষা ও সীমান্ত রক্ষার মত অল্প সংখ্যক সৈন্য সেনাপতি সাদের অধীনে রাখিয়া পূর্বাঞ্চলের সমস্ত সৈন্যকে সিরীয়া সীমান্তে চলিয়া যাওয়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন। আপাতত পূর্বাঞ্চলের সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ ঘোষণা করা হইল।

কাফুর মদীনা ত্যাগ করার কয়েকদিন পরেই হযরত হোসাইন (রাঃ) খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তখন সম্রাট হেরাক্লিয়াস ও তাঁহার ভাই থিওডোরাস কর্তৃক সিরিয়া সীমান্তে নিয়োজিত ২৪ হাজার রোমীয় বাহিনীর পাল্টা জবাব দিবার বিষয় নিয়া মজলিসের শুরার সাথে পরামর্শ করিতেছিলেন।

হযরত হোসাইন (রাঃ)-কে দেখিয়াই হযরত ওমর (রাঃ) উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সস্নেহ কাছে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সৈয়দ বাবাজী কি মনে করে?

হযরত হোসাইন (রাঃ) বলিলেন, বিশেষ প্রয়োজনে আমি আপনার কাছে এসেছি।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার মাতাপিতা আপনার জন্য কোরবান হোক। মেহেরবানী করে আজ্ঞা করুন। আপনার প্রয়োজনে গোলাম প্রাণ দেবে।

হযরত হোসাইন (রাঃ) খলীফার কানে কানে বলিলেন, আমি বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছি যে, ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে সম্রাট ইয়াজদিগার্দ মাদায়েন কারাগারে কতিপয় মুসলমানকে বন্দী করে রেখেছেন। তাদের আশু উদ্ধারের প্রয়োজন।

খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা মজলিসে শুরার আলোচনায় পেশ করিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে সাব্যস্ত হইল হেরাক্লিয়াসের সাথে বোঝাপড়া পরে হইবে। ইয়াজিগার্দকে সমুচিত শিক্ষা এবং বন্দী মুসলমানদের উদ্ধার সর্বাগ্রে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

হযরত ওমর (রাঃ) তৎক্ষণাৎ সিরিয়া রণাঙ্গনে সেনাপতি কাকাকে নির্দেশ পাঠাইলেন যে, তিনি যেন অনতিবিলম্বে পারস্য চলিয়া যান এবং সেনাপতি সাদ

বিন আবি ওয়াক্কাছকে সাহায্য করেন। এই দিকে পূর্বাঞ্চলীয় সেনাপতি সাদকেও নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন কাদেসিয়ায় যাইয়া কাকার অপেক্ষা করিতে থাকেন এবং কাকার সাথে সম্মিলিতভাবে মাদায়েন অধিকার করিয়া কারাগারের সমস্ত বন্দীকে মদীনায় প্রেরণ করেন।

বুয়ায়েবের যুদ্ধের পরাজয়ে সম্রাট ইয়াজদিগার্দকে আহত সিংহের মত ক্ষেপাইয়া তুলিল। তিনি নূতন উদ্যোগে সৈন্য সংগ্রহে মনোযোগী হইলেন। সৈন্যদের বেতন বৃদ্ধি করা হইল। বংশানুক্রমে বৃত্তির ব্যবস্থার প্রবর্তন হইল। দেখিতে দেখিতে সৈন্যসংখ্যা ত্রিগুণ বৃদ্ধি পাইল। সম্পূর্ণ নূতন কায়দায় সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়া অধিক কৌশলী করিয়া তোলা হইল। নূতন নূতন অস্ত্র তৈয়ার ও আমদানী করা হইল। বিশ্ববিখ্যাত মহাবীর রুস্তমকে ১২ হাজার সৈন্যের প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করিয়া সম্রাট নিজেও সেনাবাহিনীর সাথে কাদেসিয়ায় রওনা হইলেন। সম্রাটের ইচ্ছা ইসলাম ধর্ম, মুসলিম জাতি, ইসলামী রাষ্ট্র ও মদীনাকে দুনিয়ার বুক হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবেন।

মাদায়েনের সৈন্য শিবিরের রিজার্ভ বাহিনী হইতে দুর্ধর্ষ সেমেটিক জাতীয় বাছা বাছা নও-জোয়ানদের নিয়া একটি অতিরিক্ত বাহিনী গঠন করিয়া সেনাপতি শমশিরকে তাহার ভার দেওয়া হইল। শমশিরকে সম্রাট নির্দেশ দিয়া গেলেন যে, তিনি যেন হঠাৎ যুদ্ধের মাঠে আসিয়া অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া মুসলমানদের মনোবল ভাঙ্গিয়া দেন।

৬৩৫ খৃস্টাব্দে ডিসেম্বরের এক সকালে সেনাপতি সাদ বিন আবি ওয়াক্কাছ সসৈন্য কাদেসিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্রাট বাহিনী আগেই আসিয়া কাদেসিয়ায় সমবেত হইয়াছিল। যুদ্ধ প্রারম্ভের পূর্বেই খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) নির্দেশ মোতাবেক পারস্য সম্রাটের নিকট ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাইয়া সেনাপতি সাদ একজন দূত প্রেরণ করিলেন। সেনাধ্যক্ষ ও মহাবীর রুস্তমের গর্বে গর্বিত সম্রাট ইয়াজদিগার্দ দূতের মাথায় এক টুকরি মাটি উঠাইয়া দিয়া বলিলেন, পারস্যের মাটির প্রতি তোমার বড় লোভ! তাই দিয়ে দিলাম নিয়ে যাও।

দূত মাটির টুকরিটি বহন করিয়া সেনাপতি সাদ সকাশে যাইয়া উল্লাসে বলিতে লাগিলেন, সম্রাট নিজ হাতে তার নিজ দেশের অংশবিশেষ আমাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। জয় আমাদের নিশ্চিত। উপস্থিত সকলেই উল্লাসে ফাটিয়া পড়িলেন।

সেনাপতি রুস্তমকেও অনুরূপভাবে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হইল। তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, আরবের দম্ভ আমি চূর্ণ করে ছাড়ব।

সিরিয়া সীমান্ত হইতে কাকা আসিবার পূর্বেই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। অসুস্থতার জন্য সেনাপতি সাদ যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হইতে না পারিয়া একটি

প্রাসাদের ছাদে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ দেখিতেছিলেন এবং রণাঙ্গনে বিভিন্ন নির্দেশ পাঠাইতেছিলেন। কাদেসিয়ায় তিন দিন এক রাত্রি যুদ্ধ হইয়াছিল।

প্রথম দিনের যুদ্ধে পারস্য বাহিনীতে কিছু বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। এইজন্য এই দিনকে আরবগণ ইয়াওমুল আরমাছ বা বিশৃংখলার দিন বলে। দ্বিতীয় দিন যথাসময়ে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মুসলিম বাহিনী বিশেষ সুবিধা করিতে পারিতেছিল না। দুপুরের দিকে সেনাপতি কাকা আসিয়া সসৈন্য যুদ্ধে যোগদান করিলেন। কিন্তু তাতেও বিশেষ ফলোদয় হইল না। সেনাপতি বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন।

বিকালের দিকে সেনাপতি শমশির দশ হাজার সৈন্য লইয়া মার মার শব্দ করিতে করিতে যুদ্ধের ময়দানে আসিতেছেন দেখিয়া সম্রাটের আনন্দ দেখে কে? তিনি বলিতে লাগিলেন, আজকেই মুসলমানরা বিনষ্ট হইবে।

শমশিরের আগমন বার্তা শুনিয়া সেনাপতি সাদ ও মুসলিম বাহিনী একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। কিন্তু না। দেখা গেল শমশির তাঁহার বাহিনী লইয়া সম্রাট বাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। সম্রাট দেখিলেন তাঁহার দীর্ঘদিনের অনুগত সেনাপতি শমশিরের শমশির তাঁহারই সৈন্যদের শিরের উপর পড়িতেছে। কোন মন্ত্র বলে ইহা সম্ভব হইল সম্রাট তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

সেনাপতি সাদ বিন আবি ওয়াক্কাছ ছাদ হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া চমকিত হইলেন। সুদূর পারস্যে কে এই দ্বীনের খাদেম তিনি তাহা ভাবিয়াও কূলকিনারা করিতে পারিলেন না।

শমশিরের অযাচিত সাহায্য পাইয়া মুসলমানদের মনোবল বাড়িয়া গেল। পারস্য বাহিনীকে সমবেতভাবে তাঁহারা আক্রমণ করিলেন। পারস্য বাহিনী এই আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া সে দিনের মত যুদ্ধে বিরত হইল।

দুই দিক হইতেই সাহায্য আসিয়াছিল বলিয়া আরবগণ এই দিনকে ইয়াওমুল আগওয়াছ বা সাহায্যের দিন বলিয়া অভিহিত করে।

যুদ্ধশেষে সেনাপতি সাদ নিজেই শমশিরের কাছে যাইয়া তাঁহাকে সালাম করিয়া আলিঙ্গন করতঃ হস্ত চুম্বন করিয়া তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিলেন।

শমশির সহাস্য বলিলেন, আগে তো ইসলামের শত্রু খতম করি। তারপর হবে পরিচয়। শমশিরের কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সেনাপতি সাদ তাঁহাকে আর কিছু বলিলেন না। যুদ্ধের তৃতীয় দিনে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাছ, কাকা ও শমশিরের সম্মিলিত বাহিনীর তীব্র আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া পারস্য বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। যুদ্ধে নিহত হইল ৫০ হাজার পারসিক সৈন্য। মহাবীর রুস্তম পলায়নকালে নদীতে ডুবিয়া মারা যায় এবং সেনাপতি বাহমন নিহত হইল। পারস্য সেনাবাহিনীর আর দুর্দশার সীমা-

পরিসীমা রহিল না। এইজন্য এই দিনকে বলা হয় ইয়াওমুল উম্মাছ বা দুর্দশার দিন। এই দিন রাত্রেও যুদ্ধ হইয়াছিল। এই রাত্রিকে বলা হয় লাইলাতুল হারীর বা গোলযোগপূর্ণ রাত্রি। সমাট ইয়াজদিগার্দ প্রাণটুকু মাত্র লইয়া কোন রকমে রাজধানী মাদায়েন পৌঁছিলেন।

এত বড় বিজয় মুসলমানদের ভাগ্যে ইতিপূর্বে আর ঘটে নাই। এই যুদ্ধে ৩০ হাজার মুসলিম সৈন্যের মধ্যে প্রথম দুই দিনে আড়াই হাজার এবং তৃতীয় দিনের যুদ্ধে ৬ হাজার মুসলমান শহীদ হন। যুদ্ধের পর সাদ শমশিরের পরিচয় হইল।

১৮

কাদেসিয়ার যুদ্ধের পর খলীফার নির্দেশানুসারে সেনাপতি সাদ সসৈন্য পারস্যের রাজধানী মাদায়েনের দিকে দ্রুত ধাবিত হইলেন। মুসলিম বাহিনী মুহুর্মুহু তকবীর ধ্বনি করিতে করিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়া পঙ্গপালের মত নগরে প্রবেশ করিতেছে। সম্রাট যে কোনরূপ প্রতিরোধই গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই এমন নহে, বরং তাঁহার সমস্ত প্রতিরোধই মুসলমানদের কাছে মাকড়সার জালের মতই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। নগরের লোকজন যে যেদিকে পারিতেছে প্রাণভয়ে ছুটিয়া পালাইতেছে। সেনাপতি সাদ পালায়নপর ভীত জনতাকে অভয় দান করিতেছেন, আপনারা কেহ নগর ঘর-বাড়ী পরিজন পরিত্যাগ করে পালাবেন না। আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নেই, নেই কোন বৈরিতা। আমরা আপনাদের জান-মালের হেফাজতকারী।

কেহ বা সেনাপতির আশ্বাসবাণীতে বিশ্বাস করিয়া নিরস্ত হইল, কেহ বা নিরস্ত হইল না। মোটকথা এই অবস্থায় নগরময় একটা ছুটাছুটি হুটাহুটি পড়িয়া গেল।

সম্রাট-পরিবারের অবস্থা আরও করুণ আরও বিভ্রান্তিকর। তাঁহাদের উপর কেয়ামতের ভয়াবহতা নামিয়া আসিয়াছে। পরিবারের সকলেই ত্রাহি-ত্রাহি করিয়া কেহ বা কিছু বাধা-ছাদা করিয়া, কেহ বা পরিহিত বস্ত্র ও আবরণমাত্র সম্বল লইয়া সম্রাটের নির্দেশক্রমে উত্তরের পার্বত্য এলাকা হালওয়ান অভিমুখে যাওয়ার জন্য মাদায়েনের বাহিরে খাতেমায় জড়ো হওয়ার আশায় ছুটিল। সম্রাটও বাহির হইয়া পড়িলেন। অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই নগর পরিত্যাগ করিতে হইবে।

পলায়নকালে সম্রাটের মনে পড়িল কন্যা শাহেরবানুর কথা। তাঁহাকেও সঙ্গে লইয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু সময় এমন ঘনাইয়া আসিল যে, মুসলিম বাহিনীর তকবীর ধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল। কাজেই সাহস করিয়া সম্রাট আর কারাগারে যাইতে পারিলেন না।

সকাল হইয়া গিয়াছে। খাতেমায় পৌঁছিয়া সম্রাট দেখিলেন, সম্রাজ্ঞী দিলরাজবানু এখনও এখানে আসিয়া পৌঁছেন নাই। পরিবারের অন্যাদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানা গেল, তাড়াহুড়া করিয়া মহল ছাড়িয়া বাহির হইবার সময় সম্রাজ্ঞী দিলরাজবানুও সকলের সঙ্গে ছিলেন। অন্ধকারে খাতেমার পথে ছুটিবার সময় কে কোথায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, কে জানে! পরিবারের অনেকেই তো

এখনও আসিয়া পৌছান নাই। হয়ত পিছনের কোন দলের সাথে আসিতেছেন।

এমন সময় দেখা গেল কেহ বা পায়দলে, কেহ বা গাধায়, কেহ বা খচ্চরে আরোহণ করিয়া সম্রাট পরিবারের আর একটি দল এই দিকে আগাইয়া আসিতেছে। সম্রাট আশান্বিত হইলেন, নিশ্চয়ই দিলরাজ এই কাফেলায় হইবেন। কিন্তু না। দিলরাজবানু ইহাদের সাথেও নাই। তাহারা জানাইল, সম্রাজ্ঞীকেও তাহাদের সাথে ছুটিতে দেখিয়াছিল। কিন্তু অন্ধকারে তিনি কোথায় ছিটকাইয়া পড়িয়াছেন, তাহা কেহ বলিতে পারিল না। বেলা এক প্রহর নাগাদ পরিবারের সমস্ত লোকজন আসিয়া যখন পৌছিয়া গেল, অথচ দিলরাজবানু আসিলেন না, তখন সম্রাটের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! নির্ঘাত তিনি মুসলমানদের হাতে বন্দী হইয়াছেন। হায়! হায়! উপায় কি? তাঁহার সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী মুসলমানদের হাতে বন্দী হইয়া নির্যাতিতা হইবেন? বাঁদী হিসাবে কাহারো বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করিবেন? অসহ্য ও অসম্ভব। অক্ষমতায়, লজ্জায় ও অপমানে সম্রাট নিজের মাথার চুল টানিতে লাগিলেন। কয়েকজনকে তিনি সাধিলেনও। কিন্তু নিজের জীবন বাজি রাখিয়া দিলরাজবানুকে খুঁজিবার জন্য কেহই মাদায়েন যাইতে রাজী হইল না। যাঁহার অংগুলি হেলানে যুদ্ধের ময়দানে শির দিবার জন্য হাজার হাজার মানুষ ছুটিয়া যাইত আজ তাঁহার অনুরোধে একজন লোকও মাদায়েন যাইতে রাজী নয়। অগত্যা সম্রাট নিজেই সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া মাদায়েন যাইয়া দিলরাজবানুকে খুঁজিয়া আনিবার জন্য রওনা হইলেন।

এমন সময় দেখা গেল মাদায়েন হইতে একটি লোক দ্রুত অশ্বারোহণে এই দিকেই আসিতেছে। লোকটিকে মাদায়েনের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, রক্ষা নেই জাহাপনা, পঙ্গপালের মত মুসলমান নগরে প্রবেশ করিয়াছে, দখল করে নিয়েছে রাজপ্রাসাদ। দেখলাম, এদিকেও ছড়িয়ে আসছে বহু সৈন্য। আমি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসছি। এই বলিয়া লোকটি কালবিলম্ব না করিয়া আবার ছুটিল।

দরজা দিয়া ঘরে অভাব-অনটন প্রবেশ করিলে জানালা দিয়া যেমন প্রেম ভালবাসা পলাইয়া যায়, তেমনি লোকটির কথা শুনিয়া ক্ষণপূর্বে প্রিয় স্ত্রীকে উদ্ধার করার সকল সংকল্প সম্রাটের মন হইতে তিরোহিত হইয়া সেখানে নিজে বন্দী হওয়ার ভয় বাসা বাঁধিল। তিনিও কালবিলম্ব না করিয়া হালওয়ানের দিকে ধাবিত হইলেন।

সকলের সঙ্গে সম্রাজ্ঞী দিলরাজবানুও পালাই পালাই করিয়া মহল হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় মানুষ দলে দলে শহর ছাড়িয়া চলিয়াছে। কাহারা যায়, অন্ধকারে তাহা চিনিবার উপায় রহিল না। পরিবারস্থ সবাই জনস্রোতের সঙ্গে রাস্তায় নামিয়া পড়িল। কিন্তু দিলরাজবানু ঠাঁয় দাঁড়াইয়া রহিলেন, কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না। সম্রাটের মত তাঁহার মনেও উদয়

হইল শাহেরবানুর কথা। তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

মহানবীর ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়াছে বা ফলিতে শুরু করিয়াছে। টুকরা টুকরা হইয়া যাইতেছে সাম্রাজ্য। মাদায়েনও সম্রাটের হাত ছাড়া হইল। এতদিনের কেসরা প্রাসাদ হইতে, নিজেদের বাসভবন হইতে পলাতক আসামীর মত চোরের ন্যায় রাতের অন্ধকারে রিক্ত হস্তে প্রাণের মায়ায় বাহির হইতে হইল।

শাহেরবানু ভুল করে নাই। সে যাহা করিয়াছে, তাহা ঠিকই করিয়াছে, সে যাহা বলিয়াছে তাহা ঠিকই বলিয়াছে, বরং আমিই কারাগারে শাহেরবানুকে যাহা বলিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা রক্ষা করি নাই। করিব। আমার কথা আমি রক্ষা করিব।

এই মনে করিয়া দিলরাজবানু কারাগার লক্ষ্য করিয়া জনস্রোতের উল্টা দিকে ছুটিলেন। তিনি যখন কারাফটকে পৌছিলেন তখনও ভাল করিয়া সকালের আলো ফুটিয়া উঠে নাই। তিনি ফটকরক্ষীকে দ্বার খুলিয়া দিতে বলিলেন।

অন্ধকারের মধ্যে নেকাব ঢাকা এই মহিলাটি-কে ফটকরক্ষী তাহা চিনিতে পারিল না। আর কেনই বা তিনি দ্বার খুলিয়া দিতে বলিতেছেন, হুকুমই বা কাহার কাছ হইতে আনিলেন, এইসব বুঝিতে না পারিয়া দ্বাররক্ষী কারাধ্যক্ষ শেরদিলকে ডাকিয়া আনিল। শেরদিল আসিয়া সম্রাজ্ঞীকে চিনিয়া ফেলিলেন। সম্রাজ্ঞীর অভিপ্রায় মত তিনি তাঁহাকে শাহেরবানুর কক্ষে পৌছাইয়া দিলেন।

ভগ্নিত্রয় সবেমাত্র নামাজ শেষ করিয়া বসিয়াছেন এমন সময় আবির্ভাব হইল দিলরাজবানুর। তাঁহাকে পাইয়া তিন ভগ্নি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করিতে লাগিলেন। কিন্তু দিলরাজবানু বিস্ময়ে হতবাক! জল্লাদের হাত হইতেও মানুষ বাঁচিতে পারে?

মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া শাহেরবানু বলিতে লাগিলেন, আমি জানতাম মা আপনি সত্য গ্রহণে এগিয়ে আসবেন। বলা বাহুল্য সম্রাজ্ঞী দিলরাজবানু তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

কি করিয়া তাঁহারা জল্লাদের হাত হইতে বাঁচিলেন, গুলবানুর মুখে সেই কাহিনী শ্রবণ করিয়া দিলরাজবানু আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করিলেন। গুলবানুর মুখে যখন আরও শুনিলেন যে, কারাগারের প্রায় সবাই শাহেরবানুর বদৌলতেই মুসলমান হইয়া গিয়াছে এবং তিনি হযরত হোসাইন (রাঃ)-কে জয় করিয়াছেন, তখন দিলরাজবানু শাহেরবানুকে কোলে টানিয়া নিয়া কপাল চুম্বন করিয়া বলিলেন, ধন্য শাহের তুই, তোকে গর্ভে ধারণ করে ধন্য হলাম আমি!

গুল ও পরীবানুর মরদেহ খুঁজিতে গিয়া কিভাবে নাদিরা বেগম নিখোঁজ হইলেন এবং কিভাবে তিনি ফোরাতে ডুবিয়া মরিলেন, তাঁহার ওড়নাটি কোথায় কিভাবে পাওয়া গেল, সব শুনিয়া গুল ও পরীবানু অনেক কাঁদিলেন। হায় আল্লাহ! একি করিলে?

১৯

আড়াই হাজার বৎসরের কেসরা সম্রাটদের রাজধানী মাদায়েন মুসলমানগণ অধিকার করিলেন। ইয়াজদিগার্দের ধন-ভান্ডার হইতে এত সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হইল যে, ইতিপূর্বে কোন যুদ্ধেই মুসলমানগণ এত গনিমত লাভ করেন নাই। গনিমত ভাগ করার সময় ইয়াজদিগার্দের হাতের কংকনটি সোরাকার ভাগে পড়িল। ছোরাকা তাহা হাতে পরিয়া মহানবীর ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তব রূপ দান করিলেন এবং আনন্দে ও আবেগে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন-

মারারতু ফিত তারিকে লিল কাতলিন নাবীয়ে

ইতিনী বেরাহমাতিহী হাজা-ফিদ্ দোয়ায়ে!!

আমি নবীকে হত্যা করার জন্য রাস্তায় বাহির হইয়াছিলাম। তিনি দয়াপরবশ হইয়া আমাকে দোয়ার মাধ্যমে এই বস্তুটি দিয়া গিয়াছেন!

"লাও কানা হাইয়ান লা জাহাবতু, ফি খিদমাতিহী

লা গাছালতু দায়েমান, বিদ্দাময়ী কাদামিহী!!

যদি তিনি জীবিত থাকিতেন তবে বশ্যই আমি তাঁর খেদমতে হাজির হইতাম এবং আমার অশ্রু দ্বারা তাঁর পবিত্র চরণ সিক্ত করিতাম।

গনিমতের রাষ্ট্রীয় অংশ এবং মাদায়েন বিজয়ের খবর খলীফা সকাশে পৌঁছাইয়া দিয়া সেনাপতি সাদ মাদায়েনেই অবস্থান করিতেছিলেন। এরি মধ্যে একদিন মদীনা হইতে একজন কাসেদ আসিয়া সেনাপতি সাদ বিন আবি ওয়াক্কাছের হাতে খলীফার একটি পত্র প্রদান করিলেন।

পত্রটি ছিল খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) মোহরাংকিত এবং হযরত হোসাইন (রাঃ) কর্তৃক লিখিত। তাহাতে নির্দেশ ছিল, মাদায়েন কারাগারের সমস্ত বন্দীকে যেন পত্রবাহকের হেফাজতে সত্বর মদীনায় প্রেরণ করা হয়।

পত্র পাঠ করিয়া সেনাপতি সাদ কাসেদকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ভাই হারিছ, আপনাকেও আমাদের সঙ্গে কারাগারে যেতে হবে। আজকেই আমি আপনাকে মদীনা প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

সেনাপতি সাদ শমশিরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ভাই শমশির, যে মহীয়সী নারীর দ্বীন প্রচারের ওছিলায় কাদেসিয়ায় আমাদের বিজয় সহজতর হয়েছিল সেই মহীয়সীসহ সকল বন্দীকে মদীনায় প্রেরণের নির্দেশ এসেছে। চলুন, সে ব্যবস্থা করে আসি।

সেনাপতি সাদ ও শমশির যখন কারা ফটকে পৌঁছিলেন, তখন কারাধ্যক্ষ শেরদিল তাঁহাদেরকে অভ্যর্থনা জানাইলেন, এবং খলীফার নির্দেশের কথা শুনিয়া ফটকদ্বার খুলিয়া দিলেন। কারাধ্যক্ষের আহ্বানে সমস্ত বন্দী (ভগ্নিত্রয় ও সম্রাজ্ঞী ব্যতীত) এবং কর্মচারী কারা ময়দানে নামিয়া আসিল।

সেনাপতি সাদ বলিতে লাগিলেন, ভাইসব! আপনারা হয়ত শুনেছেন যে, আমরা মাদায়েন দখল করেছি। আপনারা শুনে খুশি হবেন যে, এ কারাগার এখন আর সম্রাট ইয়াজদিগার্দের শাসনাধীনে নয়। কারাগার এখন ইসলামের খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাসনাধীন। খলীফার নির্দেশেই এখুনি আপনাদের মদীনায় যেতে হবে। আপনারা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হোন।

কারাধ্যক্ষ শেরদিল, সেনাপতি শমশির ও মদীনার কাসেদ হারিছের উপর যাত্রায়োজনের সমস্ত ভার প্রদান করিয়া সেনাপতিসাদ খলীফার পরবর্তী নির্দেশানুসারে সসৈন্য হালুয়ান অভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

অকস্মাৎ এই খবর শুনিয়া বন্দী মুসলমানগণ আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে কারাগার মুখরিত করিয়া তুলিল। আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাহারা কোলাকুলি করিতে লাগিল। তাহাদের আনন্দ আজ দেখে কে? আজ তাহারা মুক্ত স্বাধীন, তদুপরি মদীনা যাওয়ার একটি অতিরিক্ত আনন্দ। তাহাদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল!

ভগ্নিত্রয় জানালা পথে এই কান্ড দেখিয়া শুনিয়া আনন্দে আল্লাহর শুকরিয়া করিতে লাগিলেন। সকলের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি আসন্ন।

মুষ্টিমেয় অমুসলিম বন্দী ও কর্মচারী এই অভাবনীয় কাণ্ড দেখিয়া হতবাক হইয়া গেল। তাহারা ভাবিয়াই পাইল না গোপনে গোপনে এত বন্দী ও কর্মচারী কার প্রচারে কবে ইসলাম গ্রহণ করিল! পট পরিবর্তন ঘটিয়াছে দেখিয়া তাহারাও ইসলাম গ্রহণ করিয়া মদীনায় রওয়ানা হইল।

মদীনার কাসেদ হারিছ এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি ভাবিয়াও পাইলেন না ইয়াজদিগার্দের কারাগারে এত মুসলমান বন্দী হইল কেমন করিয়া? অথচ হযরত হোসাইন (রাঃ)-ও এই সম্বন্ধে কিছু বলিয়া দেন নাই। তবে কি তিনিও এই সব জানিতেন না? হয়ত বা তাহাই। যাহা হউক, তাঁহার নির্দেশ মোতাবেক কাজ করিতেই হইবে। তিনি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের মধ্যে কাফুর নামে কে আছেন?

ভীড় ঠেলিয়া কাফুর আগাইয়া আসিয়া বলিল, বান্দা হাজির!

হারিছ কাফুরের সঙ্গে করমর্দন করিয়া বলিলেন, ভাগ্যবান যুবক, হযরত হোসাইন (রাঃ) আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং আমার সঙ্গেই মদীনায় যেতে বলেছেন।

কাফুর আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া, "এই যে আমি আসছি আলা হযরত" বলিয়াই এমন লম্বা দৌড় মারিল যে, মনে হইল সে বুঝি এখুনি হযরত হোসাইন

(রাঃ)-র খেদমতে উপস্থিত হইবে। তাঁহার পাগলামি দেখিয়া অনেকেই হাসিয়া উঠিল, আর অনেকেই তাহার সৌভাগ্য দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

হারিছ তাহাকে থামাইয়া ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, "আরে ভাই! একেবারে যে অস্থির হয়ে পড়েছেন! একাই চলে যাবেন নাকি'? এই বলিয়া হারিছ কাফুরকে আড়ালে ডাকিয়া নিয়া কানে কানে কি কি যেন বলিলেন এবং কি কি যেন বুঝাইয়া দিলেন!

আসুন আমার সাথে। এই বলিয়া কাফুর হারিছকে লইয়া শাহেরবানুর দরজায় পৌঁছিয়া ডাকিল, মদীনার কাসেদ এসেছেন আম্মি! দরজা খুলুন। শাহেরবানু দরজা খুলিয়া দিয়া বলিলেন, মদীনার কাসেদকে ভেতরে নিয়ে এস কাফুর।

হারিছ কক্ষে প্রবেশ করিয়া শাহেরবানুকে সালাম দিয়া বলিলেন, মহামতি হযরত হোসাইন (রাঃ) শাহজাদীকে সালাম জানিয়েছেন এবং তাঁকে সসম্মান মদীনা নিয়ে যাওয়ার জন্য এ খাদেমকে পাঠিয়েছেন। এই বলিয়া হারিছ একটি অংগুরীয় শাহেরবানুর হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, আলা হযরত বলে দিয়েছেন, আপনি এ অংগুরীয় চিনতে পারবেন!

আংটি হাতে লইয়া শাহেরবানু চিনিতে পরিলেন, এটি তাঁহারই দেয়া সেই আংটি। বুঝিলেন আংটি বাহকের সঙ্গে মদীনায় যাইবার ইংগিত ও বিশ্বস্ততার প্রতীক হিসাবে ইহা প্রেরণ করা হইয়াছে। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি।

আপনি প্রস্তুত হোন। আমি সওয়ারের ব্যবস্থা করছি। এই বলিয়া হারিছ গমনোদ্যত হইলে শাহেরবানু বলিলেন, কিন্তু   ।

গমনে ক্ষান্ত দিয়া হারিছ বলিলেন, বলুন! এই অধম হুকুম তামিল করতে প্রস্তুত।

শাহেরবানু সলজ্জভাবে বলিলেন, আমার সঙ্গে আরও তিন জন মহিলা যাবেন।

হারিছ সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, তাঁরা কে?

শাহেরবানু বিনম্রভাবে বলিলেন, আমার আম্মি ও আপা।

হারিছ খুশী হইয়া বলিলেন, আলহামদু লিল্লাহ! কোন অসুবিধা হবে না। হারিছ বাহির হইয়া গেলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই হারিছ যাত্রার আয়োজন সমাপ্ত করিয়া প্রায় তিন শত কারাবন্দীকে উন্মুক্ত স্থানে সমবেত করিলেন। কারা কর্মচারীদের মধ্যে কারাধ্যক্ষ শেরদিল, জল্লাদ মাহতাব ও সেনাবাহিনীর শমশিরও রওজা মোবারক জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সঙ্গী হইলেন।

সম্রাজ্ঞী ও শাহজাদীদের জন্য পৃথক পৃথক উট ও হাওদার ব্যবস্থা করা হইল। অন্যদের কেহ অশ্ব, কেহ উট কেহ বা গাধা-খচ্চরে সওয়ার হইলেন। সকলের মুখে তৌহিদের মন্ত্র, বুকে ইসলামী জোশ।

হারিছ কাফেলার অধিনায়ক হইয়া মদীনা যাত্রা করিলেন।

২০

দীর্ঘ সাতটি বৎসর পিতার কারাগারে বন্দী জীবন যাপন করিয়া শাহেরবানু মুক্ত আলো বাতাসে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখে আল্লাহর শুকরিয়া, চোখে অশ্রু। তাঁহার জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙক্ষার আজ বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে। বক্ষে লুকায়িত আজীবনের সুপ্ত কিশলয়গুলি ধীরে ধীরে চোখ মেলিতেছে। তাঁহার চোখে আজ প্রিয় দর্শনে যাত্রার গোলাপী আমেজ। তিনি গাইলেন-

"শুকুরে কারদাম, ছদ হাজার আয়; জুলজালাল!

খাবে মানরা, পুরা কারদান আজ জালাল!!

হে খোদা! তোমার ক্ষমতার দ্বারা আমার সমস্ত স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিতেছ, এইজন্য আমি হাজার হাজারবার তোমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

খাহে শেবে হেস্ত ও তরাশ, আজ দোজখ।

নিস্ত যাঁকে, ছরদারে রা,জী বেশক!!

বেহেস্তের লোভ ও দোজখের ভয়, কোনটাই আমার নাই। যেহেতু বেহেস্তের সরদার আমার প্রতি রাজী আছেন। আমি নিঃসন্দেহ।

তবু শাহেরবানুর মনে নানা দুর্ভাবনা আসিয়া তাঁহাকে বারংবার আতংকিত করিয়া তুলিতেছে। তিনি ভাবেন তাঁহারা রাষ্ট্রীয় বন্দী হিসাবে মদীনায় যাইতেছেন। খলীফা তাঁহাদের প্রতি কেমন ব্যবহার করিবেন কে জানে! ইসলামের মহাশত্রু সম্রাট ইয়াজদিগার্দের কন্যা বলিয়া যদি তাঁহাদের প্রতি কঠোর সাজার ব্যবস্থা হয়? তখন কি হযরত হোসাইন (রাঃ) তাঁহাদের রক্ষা করিতে পারিবেন না?

আবার ভাবেন কোথায় কিভাবে হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর সঙ্গে তাঁহার প্রথম পরিচয় হইবে। তিনি কি তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন? আর হযরত হোসাইন (রাঃ)-ই বা তাঁহাকে কেমন করিয়া চিনিবেন? নিশ্চয়ই কাফুর একটা উপায় করিবেই। কিন্তু এই ব্যাপারে তিনি কাফুরকে কিছু জিজ্ঞাসাও করিতে পারিলেন না। লজ্জা আসিয়া বাধা দিল। অগত্যা আল্লাহ যা করেন এই মনে করিয়া তিনি ধৈর্যসহকারে আল্লাহর নাম স্মরণ করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিলেন।

দুর্গম মরুপ্রান্তর ও বনপাহাড়ের পথ অতিক্রম করিয়া কাফেলা একদিন মদীনায় পৌছিল। হারিছ খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট বন্দীদের

বুঝাইয়া দিলেন এবং হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর কাছে সমস্ত বিবরণ পেশ করিলেন। হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর নির্দেশক্রমে হারিছ কাহারো কাছে আর কিছুই বলিলেন না।

এই দিকে শহরে প্রচারিত হইল যে, সম্রাট ইয়াজদিগার্দের একজন পত্নী ও তিনটি কন্যাসহ কয়েক শত বন্দী মদীনায় পৌছিয়াছে। বন্দীদের প্রতি কি দণ্ডাদেশ জারি হয় তাহা দেখিবার জন্য শত শত মানুষ মসজিদে নববী প্রাঙ্গণে আসিয়া ভীড় করিল। সমস্ত বন্দী দরবারে হাজির করা হইল। সম্রাজ্ঞী ও সম্রাট তনয়ারাও এক পার্শ্বে স্থান পাইলেন।

দরবারে খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) ছাড়াও হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত জুবায়ের, হযরত তালহা, হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ, হযরত আবু বকরের পুত্র মুহাম্মদ, হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর, হযরত হাসান, হযরত হোসাইন রাজিআল্লাহু আনহুম এবং হযরত আবু আইয়ুব আনছারী ও বহু গণ্যমান্য আনছার-মুহাজীর সাহাবীগণও উপস্থিত ছিলেন।

শাহেরবানু আনত চোখে যতদূর সম্ভব সন্ধানী দৃষ্টি দিয়া খুঁজিতেছেন ঈপ্সিতজনকে। এত লোকের ভীড়ে কোথায় আছেন তিনি? এখানে আসিয়াছেন কি? নাকি আদৌ আসেন নাই? আসিলেই বা চিনিবেন কেমন করিয়া? হঠাৎ দেখিলেন দরবারের এক পার্শ্বে পূর্ণ চন্দ্রের মত দুইজন যুবক দরবার আলো করিয়া বাসিয়া আছেন। শাহেরবানু নিশ্চিত হইলেন কাফুরের বর্ণনা মত ইঁহারাই সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়। কিন্তু হযরত হোসাইন (রাঃ) কে? তাঁহাকে এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হইতে উদ্ধার করিল কাফুর।

কাফুর হযরত হোসাইন (রাঃ)-কে দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে সালাম করিয়া হস্ত চুম্বন করিল এবং বলিল, গোলাম হাজির হযরতে আলা। হযরত হোসাইন (রাঃ)-ও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। কাফুরও কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার কানে কানে কি যেন বলিল!

দ্বিতীয়বার কাফুর মদীনায় আসিয়া দীর্ঘদিন ছিল বিধায় উপস্থিত প্রায় সবাই তাহাকে মৌখিকভাবে চিনিতেন। কাজেই কেহই তাহাকে বন্দী বলিয়া মনে করেন নাই। সবাই ভাবিলেন এই সেই মোসাফির! হযরত হোসাইন (রাঃ)-ও পূর্ব পরিচিত। আজ আবার দেখা হইল।

হযরত হোসাইন (রাঃ)-কে চিনিতে পারিয়া শাহেরবানু মনে মনে আল্লাহ পাকের লাখো শুকরিয়া করিলেন। তাঁহার মন-প্রাণ সেই রাঙ্গা চরণে নিবেদিত হইল। তিনি মনে মনে আবৃত্তি করিলেন,

"খেদমতাঁ পায়, বদেহ ফরছুতঃ আয় খোদা!

জিরে আপায়, কারদাবুদাম, জান ফেদা!!

আয় খোদা! ঐ রাঙ্গা চরণ সেবা করার সুযোগ আমাকে দাও। ঐ চরণ তলেই জীবন উৎসর্গ করিলাম।

চুকে পরওয়া, নাশুজাদ আয়, দরচেরাগ!

জীন্দেগানী, দরপায়ে আঁ, তা ফেরাগ!!

পতঙ্গকুল যেমন নাকি প্রদীপের মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মাহুতি দেয় আমিও তেমনি ঐ চরণে আমরণ জীবন বিসর্জন দিলাম।

ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বারংবার তাঁহার চক্ষুদ্বয় সেই পূর্ণচন্দ্র মুখটির উপর পতিত হয়। একবার চারি চোখের দৃষ্টি বিনিময় হইয়াও গেল। প্রথম প্রিয় দর্শনের পুলক-লাজে শাহেরবানুর মুখমন্ডল গোলাপ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। বুকের ভিতর শুরু হইল এক লজ্জানন্দের প্রলয় হিল্লোল। ভাগ্যিস! তাহা বাহিরে প্রকাশ পাইল না।

গুল ও পরীবানু শাহেরবানুর ঈপ্সিত জনকে চিনিতে পারিয়া ছোট বোনের ভাগ্যকে অভিনন্দন না জানাইয়া পারিলেন না।

খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) ভাবিতেছেন, এই বন্দীদের মাঝে কয়েকজন মুসলমানও আছেন বলিয়া হযরত হোসাইন (রাঃ) জানাইয়াছেন। কাজেই সর্বাগ্রে তাঁহাদের পরিচয়ই নেওয়া উচিত। কিন্তু জনতার বিভিন্ন দাবির মুখে খলীফা নিজের চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তে জনতার কথাই শুনিতে বাধ্য হইলেন।

কেহ বলিলেন, সম্রাট ইয়াজদিগার্দ যেহেতু ইসলামের প্রধান শত্রু তাই তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাদের দাসী হিসাবে বিক্রি করা হউক।

কেহ বলিলেন, সমস্ত বন্দীর গনিমত হিসাবে মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেই হয়।

কেহ বলিলেন, কাদেসিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে সম্রাট ইয়াজদিগার্দের সেনাবাহিনীর একটি শাখা দ্বীনের মুজাহিদ হিসাবে আমাদের পক্ষে যোগদান করায় বিজয় সহজতর হইয়াছিল বলিয়া যে খবর শোনা যায়, আমরা তাহার বিস্তারিত বিবরণ শুনিতে চাই।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ভাইসব! আমাদের মহানবী বলে গেছেন, তোমাদের মধ্যে আলী ইবনে আবি তালেব সকলের চেয়ে সুবিচারক। কাজেই আমার মনে হয় বন্দীদের বিচার, কাদেসিয়ার কাহিনী শোনা এবং সব কিছুর মীমাংসার ভার তাঁর উপরই ন্যস্ত করা হোক। সবাই এক বাক্যে খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর কথা সমর্থন করিলেন।

হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, ভাইসব! আমার অভিমত হল, সর্বাগ্রে হবে সম্রাটপত্নী ও সম্রাট তনয়াদের বিচার। তারপর শুনব কাদেসিয়ার কাহিনী। সর্বশেষ রায় হবে অন্যান্য বন্দীর। তবে আপনারা যে দাবি তুলেছেন যে,

সম্রাটপত্নী ও সম্রাট তনয়াদের দাসী হিসাবে বিক্রি করা হোক, তা সম্ভব নয়। কারণ সম্ভ্রান্তের সম্ভ্রম রক্ষা করা মহানবীর সুন্নত। মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী আবু সুফিয়ানের ইজ্জতের মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন। কাজেই এ মহিলারা ইসলামের ঘোর শত্রু ইয়াজদিগার্দের পত্নী-কন্যা হলেও সম্ভ্রান্ত বংশের পুরনারী। এঁদের প্রতি সাধারণ বন্দীদের মত ব্যবহার করা চলবে না। এঁদের ইজ্জত আবরুর প্রতি লক্ষ্য রাখতেই হবে। সুতরাং আমার অভিমত,এঁদেরকে স্বাধীনতা দেয়া হোক। হয় এঁরা অন্যত্র চলে যান, নয়ত ইচ্ছা করলে কন্যারা আমাদের যুবকদের মাঝ থেকে তাঁদের পছন্দমত স্বামী নির্বাচন করে স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারেন। সম্রাটপত্নী তাঁর যে কোন মেয়ের সাথে থাকতে পারবেন।

হযরত আলী (রাঃ)-র রায় সকলেই সোল্লাসে মানিয়া নিলেন।

জনতার দাবির কথা শুনিয়া সম্রাজ্ঞী ও ভগ্নিদের মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছিল। এইবার হযরত আলী (রাঃ) কথা শুনিয়া তাঁহাদের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাঁহারা হযরত আলী (রাঃ)-র প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া তাঁহার দ্বিতীয় প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানাইয়া দিলেন।

এইবার উপস্থিত সকলেই সম্রাট তনয়াদের স্বামী নির্বাচন দেখিবার জন্য উ ৎসুক হইয়া উঠিলেন। হযরত আলীর (রাঃ)-র নির্দেশ মোতাবেক গুলবানুকেই প্রথম স্বামী নির্বাচন করিতে হইল। তিনি দরবারের এক পার্শ্বে উপবিষ্ট খলীফা তনয় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে আংগুলি নির্দেশ পূর্বক স্বামী বলিয়া নির্বাচন করিলেন। সভার চতুর্দিক হইতে "মাশাআল্লাহ! মাশাআল্লাহ!!" বলিয়া রব উঠিল।

পরীবানু দরবারে উপবিষ্ট মরহুম খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর পুত্র মুহাম্মদকে অংগুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া স্বামী বলিয়া নির্বাচন করিলেন। জনতা "আহলান ও ছাহলান" বলিয়া অভিনন্দন জানাইলেন।

এইবার শাহেরবানুর পালা। তিনি বস্ত্রাঞ্চলের নীচে ঘামিয়া উঠিলেন। তবে কি আল্লাহ তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতেছেন? আজীবনের স্বপ্ন কি তবে সত্য হইতে চলিল?

উপস্থিত সকলেই শাহেরবানুর স্বামী নির্বাচন দেখিবার জন্য স্তব্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শাহেরবানু শিরোত্তোলন করিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। আবার দৃষ্টি বিনিময় হইল। হযরত হোসাইন (রাঃ) ও শাহেরবানু একযোগে শির নত করিলেন। তাহা কেহই লক্ষ্য করিল না। সবাই মনে করিলেন সম্রাট কন্যা বর পছন্দ করিবার জন্য চতুর্দিকে অবলোকন করিতেছেন।

শাহেরবানু মরিয়া হইয়া আর একবার শিরোত্তোলন করিয়া হযরত আলী (রাঃ)-র বাম পার্শ্বে উপবিষ্ট হযরত হোসাইন (রাঃ)-র প্রতি অংগুলি নির্দেশ করিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সভার চতুর্দিক হইতে মহাকলরোলে 'মারহাবা ছাদ মারহাবা! মারহাবা ছাদ মারহাবা' বলিয়া জনতা আনন্দে ফাটিয়া পড়িল। এমন আনন্দ ধ্বনি বুঝি মসজিদে নববী প্রাঙ্গণে ইতিপূর্বে আর কোনদিন হয় নাই! শত মুখে শাহেরবানুর সৌভাগ্য ও বুদ্ধিমত্তার কথা কীর্তিত হইতে লাগিল।

হযরত আলী (রাঃ) সম্রাট তনয়াদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এবার তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। তারপর হবে আকদে নিকাহ।

হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর পার্শ্বে উপবিষ্ট কাফুর দাঁড়াইয়া করজোড়ে বলিল, সভা সমক্ষে আমার একটি নিবেদন।

হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, বল তোমার কি নিবেদন আছে।

কাপুর করজোড়েই বলিল, সম্রাট ইয়াজদিগার্দের কন্যারা সবাই মুসলমান।

উপস্থিত জনতার মুখে বিস্ময়মাখা কণ্ঠে একযোগে উচ্চারিত হইল, এঁর মুসলমান?

জী হাঁ। কাফুরের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

সবিস্ময় আবার গুঞ্জন উঠিল। ইয়াজদিগার্দের কন্যারা মুসলমান? কি আশ্চর্য!

হযরত আলী (রাঃ) কাফুরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এরা ইসলাম গ্রহণ করলই বা কবে? আর কারাগারেই বা গেল কেমন করে?

কাফুর বিনীতভাবে বলিল, সে অনেক কথা হুজুর!

হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, এ সম্বন্ধে তুমি যা জান তা বিস্তারিতভাবে বলে সকলের কৌতূহল নিবারণ কর।

কাফুর খসরু পারভেজ কর্তৃক মহানবীর পত্র ছিন্ন করা হইতে আরম্ভ করিয়া সিফিরের মদীনা আগমন ইসলাম গ্রহণ এবং তাহার কারণ, শাহেরবানুর ইসলাম গ্রহণের ইতিবৃত্ত, সিফিরের সঙ্গে তাহাদের পলায়ন, প্রহরীদের হাতে বন্দী, সম্রাট কর্তৃক তাঁহাদের নির্যাতন, কারাবরণ ও কারাবাসের কঠোরতা, সিফিরের বদলি, শাহেরবানু কর্তৃক কারাধ্যক্ষ শেরদিলের ইসলাম গ্রহণের কথা, বন্দী ও কারা কর্মচারীদের মধ্যে ইসলাম প্রচারে শাহেরবানুর কৃতিত্ব, কারাগারে দ্বীন তালিমের ব্যবস্থায় তাঁহার ত্যাগ, সবই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিল। বুদ্ধিমান কাফুর হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর প্রতি শাহেরবানুর অনুরাগ ও উপহার আদান-প্রদানের কথা সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়া শেরদিল কর্তৃক শর্ত সাপেক্ষে তাঁহার মুক্তি, বন্দীদের মুক্তির আবেদন লইয়া মদীনায় আগমন, দৈবক্রমে কোবা পল্লীতে হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় এবং বন্দীদের আবেদন জানাইয়া তাহার মদীনা ত্যাগ সমস্তই বলিয়া গেল।

জনতা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনিতেছিলেন সেই রোমাঞ্চকর অপূর্ব কাহিনী, আর মাঝে মাঝেই "আলহামদু লিল্লাহ! সোবহানআল্লাহ!! মারহাবা! মারহাবা!!"

বলিয়া আনন্দ ও বিস্ময় প্রকাশ করিতেছিলেন। আবার মাঝে মাঝেই জনতা মহানন্দে "শাহেরবানু ছাদ মারহাবা! শাহেরবানু ছাদ মারহাবা!!" বলিয়া শাহেরবানুকে অভিনন্দন জানাইতেছিলেন।

যাঁহারা সিফিরকে চিনিতেন, তাঁহারা খলীফার কাছে সিফিরের আশু মুক্তির আবেদন জানাইতে লাগিলেন। খলীফাও জনতাকে সেইরূপ আশ্বাস দিলেন।

হযরত আলী (রাঃ) কাফুরকে প্রশ্ন করিলেন, গুলবানু ও পরীবানুর ইসলাম গ্রহণ সম্বন্ধে তুমি কি জান?

কাফুর বিনীতভাবে বলিল, তাঁহাদের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী আমার জানা নেই হযরতে আলা।

মাদায়েন হইতে আগত বন্দীদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আপনাদের কেউ কি সে কাহিনী বলতে পারেন?

কারাগারের জল্লাদ মাহতাব দাঁড়াইয়া করজোড়ে বলিল, এ অধমের সে কাহিনী জানা আছে আলা হযরত।

অতঃপর হযরত আলী (রাঃ)-র অনুমতিক্রমে মাহতাব শাহেরবানুকে দেখার জন্য দিলরাজবানুসহ গুল ও পরীবানুর কারাগারে গমন, শাহেরবানুর কাছে তাহাদের ইসলাম গ্রহণ, পরবর্তী সময়ে কারাগারে যাইয়া শাহেরবানুর কাছে দ্বীন শিক্ষার অভিপ্রায়ে তাহাদের অভিসন্ধি, যম কুঠুরীতে বন্দী এবং সম্রাটের কঠোর নির্দেশ পালন করিতে যাইয়া সে কিভাবে শাহজাদীদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল সবই বর্ণনা করিল।

গুল ও পরীবানুর নির্যাতনের কথা শুনিয়া সবাই হতবাক হইয়া গেলেন এবং পরিশেষে তাঁহাদের সহনশীলতা ও ইসলাম প্রীতির জন্য সবাই 'মারহাবা মারহাবা' বলিয়া তাঁহাদের অভিনন্দন জানাইলেন।

কাফুরের মুখে শেরদিলের পরিচয় সবাই শুনিয়াছিলেন। মাহতাবের বর্ণনা শেষে হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আপনাদের মাঝে শেরদিল নামে কেউ আছেন কি?

শেরদিল দাঁড়াইয়া সকলকে সালাম করিলেন।

হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, ভাই শেরদিল, কাফুরের কাছে আপনার ইসলাম গ্রহণের কথা এবং আপনার উদারতার কথা শুনলাম। কিন্তু কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেন সে কাহিনী এবং কাদেসিয়ার যুদ্ধে সম্রাট বাহিনীর কিছু অংশ আমাদের সাথে যোগদানের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে আমাদের কৌতূহল নিবৃত করুন।

শেরদিল তাঁহার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া শেষ করিলেন মাত্র। অমনি চতুর্দিক হইতে আবার 'শাহেরবানু ছাদ মারহাবা ছাদ

মারহাবা!!' বলিয়া রব উঠিল। শেরদিল সম্রাজ্ঞী দিলরাজবানুর ইসলাম গ্রহণের কাহিনীও বর্ণনা করিয়া শমশিরকে দেখাইয়া বলিলেন, ইনি কাদেসিয়ার কাহিনী বর্ণনা করবেন।

সুধীমন্ডলী ও জনতা এক একটি কাহিনী শুনিতেছেন, আর তাঁহাদের বিস্ময়ের মাত্রা বাড়িয়াই চলিয়াছে, কি আশ্চর্য এক শাহেরবানুকে কেন্দ্র করিয়াই এত বিস্ময়কর কাহিনী সৃষ্টি হইল! আবার জানি কি শুনিতে হয়। জনতা উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন।

হযরত আলী (রাঃ)-র অনুমতি ক্রমে শমশির খসরু পরভেজের পারওয়ানা লইয়া মহানবীকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য মদীনায় আসা এবং পরবর্তী সময়ে তাঁহার শাহেরবানুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার কারণ ও ইসলাম গ্রহণ করার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিলেন। পরিশেষে সেনাবাহিনীর মধ্যে ইসলাম প্রচারে শাহেরবানুর কৃতিত্ব ও তালিম এবং কাদেসিয়ার যুদ্ধে সেমেটিক সেনাবাহিনীর কার্যক্রমের কারণ হিসাবে তাঁহার প্রতি শাহেরবানুর নির্দেশের কথা যখন বলিয়া শেষ করিলেন, তখন আরেক দফা চতুর্দিক হইতে শাহেরবানু ছাদ মারহাবা! ছাদ মারহাবা, বলিয়া ধ্বনি উত্থিত হইল।

শাহেরবানুর আল্লাহভীতি, ধর্মভীরুতা, নবীভক্তি, দ্বীন প্রচারেব একনিষ্ঠতায়, ইতিহাস সৃষ্টিকারিতায়, বুদ্ধিমত্তায় এবং সর্বশেষ স্বামী নির্বাচনের দূরদর্শিতায় সবাই যখন পঞ্চমুখ হইয়া উঠিলেন তখন শাহেরবানু লজ্জায় যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছিলেন। আর মহামতি হযরত হোসাইন (রাঃ) স্ত্রী-গর্বে প্রতিটি মুহূর্তেই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কারতেছিলেন।

হযরত আলী (রাঃ) হামদে বারী তালা ও নাতে রাসুল শেষ করিয়া বলিলেন, কারাবন্দী মুসলমান ভাইসব! ইসলাম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে যেমন আপনাদের শরীয়তী আইনে পরিবর্তন হয়েছে, তেমনি বিগত জীবনের পাপ ও অপরাধেরও ঘটেছে পরিসমাপ্তি। কাজেই আপনারা আর কোন অপরাধে অভিযুক্ত নন বিধায় এখন মুক্ত। সেচ্ছায় স্বদেশে চলে যেতে পারেন।

আনন্দে উল্লাসে বন্দীগণ নারায়ে তাকবীর ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিল। আনছার ও মোহাজেরগণ তাঁহাদেরকে আলিঙ্গনে বরণ করিয়া লইতে লাগিলেন। মসজিদে নববী প্রাঙ্গণ এক মিলনতীর্থে পরিণত হইল।

বরণানুষ্ঠান শেষ হইলে হযরত আলী (রাঃ) ঘোষণা করিলেন, এবার হবে আকদে নিকাহ অনুষ্ঠান। আপনারা সকলেই নিমন্ত্রিত। সবাই আবার বসিয়া পড়িলেন।

২১

হঠাৎ কি হইল? গুলবানু ও পরীবানু সংজ্ঞা হারাইলেন। তাঁদের দাঁত লাগিয়া গেল। দিলরাজবানু ও শাহেরবানু পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। সবাই যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এই হরিষে বিষাদ কেন? শাহজাদীদের কি হইল! তাঁহাদের সংজ্ঞা হারাইবার কারণ কি? হযরত আলীর (রাঃ) নির্দেশক্রমে ঠাণ্ডা পানির ঝাপটা ও পাখার বাতাসের ব্যবস্থা করা হইল। বেশ কিছুক্ষণ পরিচর্যার পর তাঁহাদের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল বটে; কিন্তু এবার শুরু হইল তাঁদের কান্না।

হযরত আলী (রাঃ) তাঁহাদের আশ্বাস দিয়া বলিলেন, তোমাদের কান্নার কারণ কি বেটী? বল আমাদের সাধ্যমত হলে তা নিবারণের ব্যবস্থা করব ইনশা-আল্লাহ্।

হযরত আলী (রাঃ)-র স্নেহ বাণীতে তাঁহাদের কান্না প্রশমিত হইলে তাঁহাদের কি বক্তব্য তাহা শুনিয়া জনসমক্ষে বলার জন্য কাফুরকে নিযুক্ত করা হইল।

ভগ্নিদ্বয়ের কান্না বিজরিত কণ্ঠের আধো আধো বিবরণ এবং সম্রাজ্ঞী দিলরাজবানুর বক্তব্য হইতে কাফুর যাহা উদ্‌ঘাটন করিল, তাহাই সে জনসমক্ষে পেশ করার জন্য বলিতে লাগিল,

নিজ কন্যা গুল ও পরীবানুর দন্ডাদেশের কথা শুনে সম্রাজ্ঞী নাদিরা পাগলিনী প্রায় হয়ে জল্লাদের হাত থেকে তাঁদের বাঁচাবার জন্য বাড়ীর কাউকে না জানিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন ফুরাতের তীরে সেই রাত্রেই। কিন্তু জল্লাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ না হওয়ায় হয়ত তিনি মনে করেছিলেন, জল্লাদ তাঁদেরকে হত্যা করে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে। তাই নাদিরা বেগম নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন বলেই অনুমান করা হয়। কারণ বহু অনুসন্ধানের পর ফুরাত কূলে সম্রাজ্ঞী নাদিরার উড়নাটি খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল।

উপসংহারে কাফুর বলিল, আজ শাহজাদীদের বিয়ে। এ শুভক্ষণে মায়ের কথা মনে হওয়াটাই তাঁদের কান্নার কারণ।

শ্রোতা মন্ডলীর আবার বিস্ময়ের পালা। এত কান্ডও ঘটিল! ভগ্নিদ্বয়ের ব্যথায় সমবেদনা প্রকাশ করিতে যাইয়া কেহ আহা! হা করিতে লাগিলেন, কেহ বা নাদিরার পরিণতির জন্য হায়! হায়!! করিতে লাগিলেন, কেহ বা অনুপস্থিত সম্রাটের মুন্ডপাত করিতে লাগিলেন।

আবার বিস্ময়ের পালা! এমন সময় ঘটিল আরেক অভাবনীয় কান্ড। রওজা জিয়ারতের উদ্দেশে একটি কাফেলা ধীরে ধীরে আসিয়া সেখানে থামিল। কাফেলার বৃদ্ধ সরদার উষ্ট্র হইতে নামিয়া আসিয়া সকলকে সালাম করিয়া

দাঁড়াইলেন। হাওদা সমেত একটি উষ্ট্র হাঁটু গাড়িয়া বসিলে ধরাধরি করিয়া হাওদাটি নামানো হইল।

স্থান-কাল ভুলিয়া হঠাৎ হাওদা হইতে একজন মহিলা নামিয়া আসিয়া ছুটিয়া গিয়া গুল ও পরীবানুকে জড়াইয়া ধরিয়া কান্না জুড়িয়া দিলেন। আমার গুল-পরী. মা- আমার। তোরা বেঁচে আছিস! তোরা বেঁচে আছিস তাহলে? এখানে এলি কেমন করে মা? শাহেরবানুকে জড়াইয়া ধরিয়া মা শাহের. তুই-ও আছিস! দিলরাজবানুকে বুকে ধরিয়া. দিলু! তুইও এখানে? সম্রাজ্ঞীদ্বয় ও ভগ্নিত্রয় পরস্পরকে ধরিয়া সে কী কান্না। সে কান্নায় উপস্থিত জনতার চোখেও অশ্রু। ব্যস্ততার মধ্যে কেহ কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছে না।

ব্যাপারটি অনুধাবন করিতে পারিয়া কাফেলার বৃদ্ধ সরদার সওদাগর আল মুগিরার চোখে মুখে বিস্ময়. চোখে আনন্দাশ্রু. মুখে অনাবিল হাস্য। সুধীমন্ডলী ও জনতা বিস্ময়ে নির্বাক থ আনন্দে আপ্লুতপুলকে রোমাঞ্চিত। একি ভোজ বাজীর খেলা! কে বুঝিতে পারে আল্লাহ্‌র কুদরত! ক্ষণ পূর্বে শুনিল কি? আর এখুনি হইল কি? মুহূর্তে পট পরিবর্তন। আল্লাহ্‌র শুকরিয়া করিতে যাইয়া জনতা নারায়ে তাকবীর, ধ্বনিতে আবার মসজিদ প্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

জনতার অনুরোধ এবং হযরত আলী (রাঃ)-র অনুমতিক্রমে সওদাগর আল মুগিরা যাহা বলিলেন তাহার সারমর্ম হইল. তিনি ফুরাত বক্ষ হইতে নাদিরাকে উদ্ধার করিয়া বাড়ীতে আনিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন যে. নাদিরার মতিভ্রম ঘটিয়াছে তখন তিনি তাঁহাকে কন্যাবৎ লালন-পালন ও চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই নাদিরা সম্পূর্ণ লুপ্ত চেতনা ফিরিয়া পাইলেন এবং নিজের পরিচয়. গুল ও পরীবানুর ইসলাম গ্রহণ, সম্রাটের নির্মম নির্দেশ. কন্যাদের রক্ষা করিতে যাইয়া মহল ত্যাগ সবই বলিলেন। কিন্তু নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়ার কথা তাঁহার মনে নাই।

এরপর নাদিরা ইসলাম গ্রহণ করেন। আলমুগিরা তাঁহাকে মাদায়েনে পাঠাইতেও চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গুল-পরীহীন মাদায়েনে তিনি আর ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন না। আল মুগিরা পরিবারেই থাকিয়া গেলেন। কয়েকদিন পূর্বে তিনি যখন মদীনায় রওজা মোবারক জিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন, তখন নাদিরাও বলিতেছেন, পেদর! আমিও জিয়ারতে যাইব। তাই আলমুগিরা নাদিরাকেও সঙ্গে আনিলেন। তারপর ঘটিল এই অভাবনীয় কাণ্ড।

আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করিয়া হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, এবার "আকদে নিকাহ" অনুষ্ঠানে আর কোন বাঁধা নেই ইনশ..-আল্লাহ্।

আবার শুরু হইল আনন্দ উল্লাস। ছোট ছোট বালক-বালিকার নাচিয়া নাচিয়া দফ্ বাজাইয়া গাহিতে লাগিল.

" আহলান ওয়া ছাহলান- য়া বানাতুল গারদে, মারহাবাস বেকুম?

য়াকুনু জায়েয়ান হাছেদীন বিল হাছাদে ছায়াদাতে কুম।।

স্বাগতম! স্বাগতম!! হে ইয়াজদিগার্দের কন্যারা, তোমাদেরকে ধন্যবাদ। তোমাদের সৌভাগ্য দেখিয়া হিংসুকেরা হিংসায় জ্বলিয়া মরিবে, ধ্বংস হইবে।

লাকাদ জাআ শিরকু মিন নুরিল হুদা!

শিরকু ওয়াল গারবুল কিন্‌তারাতু বিল আকদুন নিকাহ!!

হেদায়েতের আলো দ্বারা প্রাচ্য আলোকিত হইল। বিবাহ বন্ধনের দ্বারা প্রাচ্য - প্রতীচ্যের মধ্যে সেতু নির্মিত হইল।

বুদ্ধিমতী শাহেরবানু প্রথমেই আসিয়া হযরত আলী (রাঃ)-র হাতে বয়েত গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে গুলবানু ও পরীবানুও আসিয়া তাঁহার হাতে বয়েত হইলেন।

যথানিয়মে আলী (রাঃ) আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-এর সাথে গুলবানুর; মুহাম্মদ বিন আবু বকর (রাঃ)-র সাথে পরীবানুর এবং বেহেস্তের যুবরাজ হোসাইন বিন আলী (রাঃ)-এর সাথে শাহেরবানুর বিবাহ সম্পন্ন করিয়া দিয়া দোয়া করিলেন, " আল্লাহ্ তোমাদের প্রত্যেককেই রত্নগর্ভা করুন, সুসন্তান দান করুন। "

তিন শাহজাদা তৎক্ষণাৎ উপস্থিত সকলকে মধু ও খোরমা দ্বারা আপ্যায়ন করিলেন। সকলেই আল্লাহর দরবারে নব-দম্পতিদের মঙ্গল কামনা করিতে করিতে বিদায় হইলেন। শাহজাদাগণও নিজ নিজ পত্নীদের লইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

শাহেরবানুর মত একজন সামান্যা নারী যে বিরাট কীর্তি স্থাপন করিলেন, যে ইতিহাস সৃষ্টি করিলেন, তাহার আলোচনা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে যুগ যুগান্তর ধরিয়া কীর্তিত হইতে লাগিল।

শহীদে কারবালা হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর স্ত্রী ও সৈয়দকুল শিরোমণি হযরত জয়নুল আবেদীনের গর্ভধারিণী মা এই **শাহেরবানু বা ইরান দুহিতা**

তারপরে ঃ হযরত আলী (রাঃ)-র নির্দেশক্রমেই সম্রাজ্ঞী নাদিরা বেগম ভাগাভাগি করিয়া হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর ও মুহাম্মদ বিন আবু বকর (রাঃ)-এর পরিবারভুক্ত হইলেন। দিলরাজবানু শাহেরবানুর সঙ্গে হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। বায়তুল মাল হইতে সম্রাজ্ঞীদ্বয়ের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল।

স্বামী-সংসারে আসিলে শাহেরবানুর নূতন নামকরণ করা হইল "গাজালা" বা হরিণী। স্বামী ও শ্বশুর গর্বে গর্বিতা শাহেরবানু শুকরিয়াতান আরও বেশী করিয়া এবাদত গুজার হইয়া পড়িলেন। রাত্রের অধিকাংশ সময় এবাদতে কাটাইতেন এবং প্রায় দিনই রোজা রাখিতেন। স্বামী-সংসারকে তিনি

আনন্দ-উল্লাসে সর্বদা গুলজার করিয়া রাখিতে চেষ্টিত থাকিতেন। ভক্তি-শ্রদ্ধা ও প্রেম-ভালবাসা দিয়া স্বামীকে এমনভাবে মোহিত করিয়া রাখিতেন যে, তাঁহাদের ভালবাসা ছিল তুলনাহীন ও দৃষ্টান্তমূলক। হযরত আলী (রাঃ) তাঁহাকে এমন স্নেহ-প্রীতি দিয়া ভরিয়া রাখিতেন যে, কোনকালেই কোন শ্বশুর বুঝি কোন পুত্র বধূকেই এমন করেন না!

শাহেরবানুও ছিলেন শ্বশুর বলিতে অজ্ঞান। তিনি শ্বশুরকে এমন ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন যে, সারা রাত অশ্রুজলে বুক ভাসাইয়া প্রার্থনা করিতেন, আয় মা'বুদ এতই যদি দয়া করিলে তবে এই দয়াটুকুও কর, যেন আমার একটি পুত্র সন্তান হয়। আমি তাহার নাম রাখিব আমার শ্বশুরের নামে আলী বলিয়া।

হযরত আলী (রাঃ)-র দোয়া ও তাঁহার আকুল আবেদন আল্লাহ পাক কবুল করিয়াছিলেন। তাঁহার একজন পুত্র সন্তান হইল। নাম রাখিলেন আলী আজগর। পরবর্তী সময়ে ইনিই হইলেন সৈয়দকুল শিরোমণি হযরত জয়নুল আবেদীন।

খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-ও পুত্রবধূ গুলবানুকে অত্যধিক স্নেহ করিতেন। গুলবানুর বেলায়ও হযরত আলী (রাঃ)-র দোয়া ব্যর্থ হয় নাই। ফেকাহশাস্ত্রের অন্যতম দিশারী ইমাম সালেম ছিলেন গুলবানুরই সন্তান।

ভ্রাতৃবধূ পরীবানুকে হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) প্রাণাধিক ভালবাসিতেন। এই পরীবানুর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন ইসলামের অন্যতম ফেকাহশাস্ত্রবিদ ইমাম কাজেম। ইহাও হযরত আলী (রাঃ)-র দোয়ার ফল বলিতে হইবে।

শাহেরবানুর সাথে সাথে গুলবানু ও পরীবানুও যে সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পরিশিষ্ট
ক

খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) মাদায়েনের বন্দী মুসলমানদের যথেষ্ট উপঢৌকন দিয়া বিদায় করিলেন। সওদাগর আল মুগিরাও বাদ পড়িলেন না। কারাধ্যক্ষ শেরদিলকে তাঁহার পূর্বপদেই বহাল রাখিয়া মাদায়েন পাঠাইয়া দিলেন। শমশিরকে সেনাপতি সাদ বিন আবি ওয়াক্কাছের অধীনস্থ একজন সেনানায়ক করিয়া পাঠানো হইল। মাহতাব স্বেচ্ছায় একজন মুজাহিদ হইয়া জেহাদে চলিয়া গেলেন।

কাফুর কিছুতেই হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর খেদমত ছাড়িয়া কোথাও যাইতে রাজী হইল না। সে তাঁহার নামে কোরবান। হযরত হোসাইন (রাঃ) ও কাফুরের মত একজন জানফেদা বন্ধু পাইয়া তাহাকে আশ্রয় দান করিলেন। সে

হইল হোসাইন পরিবারের একনিষ্ঠ একজন খাদেম। বিশ্বস্ত অনুচর হিসাবে হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর একজন সহচর।

খ

মাদায়েনের পতনের পর সম্রাট ইয়াজদিগার্দ প্রাণভয়ে তাঁহার অন্যতম সুরক্ষিত ও ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ নগর হালওয়ানে পলায়ন করিয়াছিলেন। সেখান হইতে তিনি পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সাদ বিন আবি ওয়াক্কাছের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। জালুলার প্রান্তরে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধেও পরাজিত হইয়া সম্রাট কাস্পিয়ান সাগরের তীরে আল রাইয়ে পলায়ন করিলেন। কিছুদিন পরে সেখান হইতে তিনি মার্ভে চলিয়া যান।

এইদিকে সম্রাট ইয়াজদিগার্দের সেনাপতি দ্বিতীয় হরমুজান মুসলিম সেনাপতি নুমানের সাথে রামহরমুজের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সুসতারে পলায়ন করেন। খলীফার নির্দেশক্রমে নুমান সুরক্ষিত সুসতার দুর্গ অধিকার করিয়া কারাগার হইতে সিফির ও জিনিয়াকে উদ্ধার করেন এবং সেনাপতি হরমুজানকে বন্দী করিয়া সিফির জিনিয়াসহ মদীনায় মহান খলীফা সকাশে প্রেরণ করেন।

সেনাপতি দ্বিতীয় হরমুজান মদীনায় আসিয়া ইসলামী পরিবেশ ও সৌন্দর্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ইসলাম গ্রহণ করতঃ ধন্য হইলেন। কিছুদিন পর তিনি স্বেচ্ছায় জেহাদে চলিয়া গেলেন।

সিফির মদীনায় আসিয়া যখন সম্রাজ্ঞীদ্বয় ও শাহজাদীদের দেখিলেন এবং শাহেরবানুর কৃতিত্বের কথা শুনিলেন তখন তিনি যেমন বিস্মিত হইলেন তেমনি শাহেরবানুকে ধন্য ধন্য বলিতে লাগিলেন।

স্নেহাস্পদ ভগ্নি দিলরাজবানুকে তিনি বলিলেন, কেমন দেখলে? আল্লাহর কুদরত দেখলে? সম্রাট পরিবারের সেরা সেরা ব্যক্তিদের আল্লাহ হেদায়েত দান করেছেন। শাহজাদীদের দান করেছেন সর্বোচ্চ সম্মান। এর বেশী আর কি চাস্ বোন?

দিলরাজবানু বলিলেন, আমরা আল্লাহর লাখো শুকরিয়া করছি ভাইজান যে, আল্লাহ আমাদের ভোগ বিলাসের পংক হতে উদ্ধার করে হেদায়েতের নূর দ্বারা স্নাত করে কৃচ্ছ্রতার স্বর্গসুখ ও আনন্দ দান করেছেন।

শাহজাদী শাহেরবানুকে সিফির বলিলেন, বেটী! যেদিন আমি হযরত ফাতেমা (রাঃ)-র কাজের সাথে দৈবক্রমে তোর কাজের অপূর্ব মিল দেখেছিলাম সেদিনই ভেবেছিলাম নিশ্চয়ই এর পিছনে মহান আল্লাহপাকের কোন ইংগিত আছে। দেখ বেটী, সে ইংগিত আজ আল্লাহ কিভাবে মূর্ত করে তুললেন। তোর দ্বারা ইসলামের কী বিরাট খেদমত নিলেন।

শাহেরবানু বলিলেন, এতে আমার কোন কৃতিত্বই নেই মামা। আমার দ্বারা যদি কিছু হয়ে তাকে তবে তা হয়েছে আপনার শিক্ষার বদৌলতেই। আমি শুধু আপনার শিক্ষাটাকেই কাজে লাগিয়েছি। কৃতিত্ব যদি কিছু হয়ে থাকে তবে সেটা মূলত আপনার, আমার নয়।

সিফির বলিলেন, সবই আল্লাহর ইচ্ছা, বেটী। কাফুরকে সিফির বলিলেন, তুমি হযরত হোসাইন (রাঃ)-র সেবায় স্বেচ্ছায় নিজেকে নিযুক্ত করেছ জেনে আমি খুবই প্রীত। তুমি পরকালের পথ খোলাসা করে নিয়েছ। তুমি আমার জন্য দোয়া করবে।

জিনিয়াকে পাইয়া শাহেরবানু আনন্দে আপ্লুত। তিনি বলিলেন, কারাগারে যদি আপনাকে না পেতাম মামানী, তবে আমার জীবন হয়ে উঠত দুর্বিষহ। না হত আমার শিক্ষা, না হত আমার সাধনার পূর্ণতা। আমার সাফল্যের পেছনে অনুগ্রহ করে আল্লাহ পাক আপনাকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন অন্যতম একজন দিশারী হিসেবে।

জিনিয়া শাহেরবানুকে কোলে টানিয়া লইয়া বলিলেন, এই সবই আল্লাহর ইচ্ছে মা। তুমি যে আমাদের সকলের গৌরব, এটাও আল্লাহের অপার অনুগ্রহ। আমরা এজন্য আল্লাহর শুকরিয়া কীর্তন করি।

সিফির ও জিনিয়া কিছুদিন মদীনায় কাটাইয়া খলীফার অনুমতিক্রমে স্বদেশ মাদায়েনেই স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার জন্য চলিয়া গেলেন।

গ

সম্রাট ইয়াজদিগার্দ শেষবারের মত খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)র সাথে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইলেন। হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের আশায় সম্রাট ১৫০০০ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সেনাপতি ফিরোজানের নেতৃত্বে মুসলমানদের মোকাবিলার জন্য এলবুর্জ পাহাড়ের পাদদেশে প্রেরণ করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) এই খবর পাইয়া সম্রাট বাহিনীর সাথে মোকাবিলা করিবার জন্য ৩০ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সেনাপতি নুমান বিন মুকাররানকে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করিলেন। ৬৪১ খৃষ্টাব্দে 'নিহওয়ান্দে' উভয় বাহিনী এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এই যুদ্ধই হইল সম্রাটের জীবনের শেষ যুদ্ধ।

যুদ্ধে সম্রাট বাহিনী সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হইল। নিহওয়ান্দের ময়দানে সুদীর্ঘ আড়াই হাজার বৎসরের ঐতিহ্যবাহী কেসরা সাম্রাজ্য-রবি চিরতরে হইল অস্তমিত।

মুসলমানগণ ধীরে ধীরে ইস্তাখার, ইস্পাহান, ফারস, সিস্তন, মাকরান, খোরাসান, কিরমান, তাবারিস্থান, আজারবাইজান ইত্যাদি অধিকার করিলেন।

'খসরু যেমন আমার পত্রটি টুকরো টুকরো করে ফেলেছে, তেমনি তার রাজ্যও অচিরেই মুসলমানদের হাতে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, মহানবীর এই ভবিষ্যদ্বাণী এইভাবে সম্রাট তৃতীয় ইয়াজদিগার্দের সময়ে অক্ষরে অক্ষরে ফলিল।

০ ০ ০ ০

সম্রাট তৃতীয় ইয়াজদিগার্দের সন্ধান আর কেহই দিতে পারিল না। সম্রাটের কথা মাদায়েনের কথা সবাই এখন ভুলিয়া গিয়াছে। কেহই সম্রাটের কথা আর মনেও করে না। তাঁহার জন্য একটি ফোঁটা চোখের পানি ফেলিবার মানুষ একজনও বুঝি পৃথিবীতে নাই। ইহাই বুঝি অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস! যে নও-শেরওয়ার কথা মানুষ আজও শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করে, যে প্রথম ও দ্বিতীয় ইয়াজদিগার্দের ও খসরু পারভেজের ভয়ে বাঘে-ছাগে এক ঘাটে পানি খাইত, সেই তাঁহাদেরই উত্তরসুরি তৃতীয় ইয়াজদিগার্দের কথা আজ কেহ ভাবেও না। কে জানে, কোথায় আছেন সম্রাট?

আল্লাহ্ কোরআন পাকে বলিয়াছেন, "তুতিল মুলকা মান তাশায়ু ওয়া তানজিওল মুলকা মিম মানতাশা।"

আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন আর যাহাকে ইচ্ছা রাজ্যচ্যুত করেন।

কবি বলেন,

"কাদরতে কুদ-রতেদারী, হারচেখাহী-আকুনী

গেদারাতু-মুলকে বখশী, ছুলতারাগে, দাকুনী

কাদেরে কুদরত মাওলা যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিতে পারেন। ফকীরকে বাদশাহ করিতে পারেন, বাদশাহকে ফকীর করিতে পারেন।

হতভাগ্য তৃতীয় ইয়াজদিগার্দের ভাগ্যেও তাহাই হইল। ঐতিহ্যবাহী কেসরা বংশে আড়াই হাজার বৎসরের যত সম্রাট বিগত হইয়াছেন তাঁহাদের সমস্ত অন্যায় ও পাপের জের এবং মহানবীর অভিসম্পাতের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ! সবই আসিয়া বর্তাইল এই অভিশপ্ত তৃতীয় ইয়াজদিগার্দের উপর।

ঘ

গ্রীষ্মের দুপুর। মাথার উপর অগ্নিঝরা প্রখর মার্তন্ড তাপ। মদীনার পথঘাট খইফোটা উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। রাস্তায় লোকজনের চলাফেরা নাই। কদাচিৎ দুই একটি উষ্ট্রকে দেখা যায়, নাসারন্ধ্রে ফেনা নির্গত করিয়া ধীরে ধীরে পথ চলিয়াছে।

একজন বিদেশী পথিক তপ্ত কটাহ এই নির্জন পথে ঘর্মসিক্ত হইয়া ক্লান্ত পদক্ষেপে অবসন্ন দেহটাকে কোন রকমে টানিয়া লইয়া মসজিদে নববী অভিমুখে

হাঁটিয়া চলিয়াছেন। পথিকের শত ছিন্ন মলিন জামা-কাপড় মাথায় ততোধিক মলিন একটি পাগড়ী, বহুতালিযুক্ত বিবর্ণ পাদুকাদ্বয়। ধূলি-ধূসরিত বিলম্বিত শ্মশ্রু, অনাহারক্লিষ্ট চামচিটে চেহারা, কোটরাগত চক্ষু, কৃশ শরীর। অসহায় ক্লান্তি। সদা সন্ত্রস্ত ভাব। চকিত চাহনি। ভাগ্যিস! পথে-ঘাটে বালক-বালিকার দল নাই! থাকিলে পাগল বলিয়া হাততালি দিত।

পথিক মসজিদে প্রবেশ করতঃ দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া রওজা মোবারক জিয়ারতে দাঁড়াইলেন। হস্তোত্তোলন করিয়া মোনাজাতে কি বলিতেছেন কে জানে! তাঁহার শ্মশ্রুরাশি অশ্রুসিক্ত হইয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

এক সময় জিয়ারত শেষ করিয়া পথিক মসজিদের এক পাশে যাইয়া উপবেশন করতঃ উদাসীনভাবে বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। অপরিচিত দেশ অজানা শহর। কোথায় যাইবেন? কাহাকেও চিনেন না। কে বলিয়া দিবে? কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন? তাঁহাকেও তো কেহ চিনে না। কিন্তু ......। হঠাৎ যদি কেহ চিনিয়াই ফেলে? তখন উপায়? এমনি সব চিন্তা-ভাবনায় পথিক বাহ্য চৈতন্যহারা। ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণবায়ু বুঝি এখনি বাহির হইয়া যাইবে!

কাফুর রওজা মোবারক জিয়ারত করিয়া মসজিদ হইতে বাহির হইবার সময় হঠাৎ পথিককে লক্ষ্য করিয়া কাছে গিয়া সালাম করিল।

পথিক চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, কিছু বলছিলেন?

কাফুর বুঝিল, পথিক সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক। তাই সে আবার সালাম করিল।

এইবার পথিক সালামের জবাব দিয়া কাফুরের দিকে পিঠ ফিরাইয়া বসিয়া আবার অন্যমনস্ক হইলেন। যেন কাফুরের অহেতুক বিরক্ত করা হইতে বাঁচিবার জন্যই মুখ ফিরাইলেন।

নাছোড়বান্দা কাফুরও গভীর মনোযোগ সহকারে পথিকের মুখাবয়ব লক্ষ্য করিতেছিল আর স্মৃতির পাতা উল্টাইতেছিল। মুখখানি যেন বড় চেনা চেনা মনে হয়। কোথায় যেন দেখিয়াছে!

পথিক বিরক্ত হইয়া আবার পিঠ ফিরাইলেন।

আবার ঘুরিয়া পথিকের সামনে যাইয়া কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করতঃ কাফুর প্রশ্ন করিল, জনাবের দৌলতখানা?

একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া পথিক বলিলেন, তা তো নেই!

কাফুর আবার প্রশ্ন করিল, আপনি কে, জানতে পারি কি জনাব?

পথিক কাফুরের মুখের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, আমি একজন মোসাফির।

কাফুরের সন্দেহ ঘনীভূত হইল। সে যেন কিছুটা অনুমান করিয়া ফেলিয়াছে!

তাই প্রশ্ন করিল, আপনার নিবাস কি মাদায়েন?

উদাসীন কণ্ঠে পথিক বলিলেন, এখন আর নয়।

কাফুরের সন্দেহ বাড়িয়া গেল। সে কিছুটা পথিকের দিকে ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি মহামান্য সম্রাট তৃতীয় ইয়াজদিগার্দ?

পথিকের দুর্বল স্নায়ুগুলি যেন হঠাৎ সচেতন হইয়া উঠিল! তিনি তড়িতাহতের মত ভীষণভাবে চমকাইয়া উঠিলেন। যেন ধরা পড়িয়া গিয়াছেন! চারিপাশে চকিতে দেখিয়া লইয়া বলিলেন, তুমি কে?

এইবার কাফুর নিঃসন্দেহ হইল। সমাট ইয়াজদিগার্দই বটে। সে বলিল, আমি কাফুর।

কাফুর? সম্রাট কাফুরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

জ্বী! চিনতে পারছেন না আমাকে? কাফুর বলিল,

সম্রাট কাফুরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়াই প্রশ্ন করিলেন, তোমার বাড়ী কোথায়?

সম্রাটের দিকে চাহিয়াই কাফুর বলিল, মাদায়েন। এখন মদীনায়।

সম্রাট বিস্মিত কণ্ঠে ব্যগ্রতা সহকারে বলিলেন, মাদায়েনে ছিল? পরিচয় দাও।

কাফুর নীচের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, সিফির, জিনিয়া ও শাহেরবানুকে ইসলাম গ্রহণের অপরাধে যখন কারাগারে প্রেরণ করেছিলেন তখন তাঁদের সাথের চতুর্থ ব্যক্তিটিই ছিলাম আমি কাফুর।

এইবার সম্রাট কাফুরকে জড়াইয়া ধরিয়া হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কান্নাজড়িত কণ্ঠেই বলিতে লাগিলেন, যে পরিচয় দিলি তার জন্য আমি আজ তোর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী কাফুর। আমাকে ক্ষমা করে দে।

তারপর সম্রাট যুগ যুগান্তরের বুভুক্ষার মত মহাকাংগালের আগ্রহ লইয়া বলিলেন, আমি যে আমার মেয়ে শাহেরবানুকে এক নজর দেখতে এসেছি, কাফুর। সম্রাট কাফুরের হাত ধরিযা হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার অশ্রুতে কাফুরের হস্তসিক্ত হইতে লাগিল। সম্রাট আবার কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, তুই জানিস, জানিস কাফুর, আমার শাহেরবানু কোথায় আছে?

সম্রাটের করতল হইতে হস্ত মুক্ত করিয়া নিজের অশ্রু মুছিতে মুছিতে কাফুর বলিল, জানি! সম্রাট।

সম্রাট আবার কাফুরের হাত ধরিয়া বলিলেন, আমাকে দেখাতে পারিস? আমি দূর থেকেই এক নজর দেখেই চলে যাব। দূর থেকেই ক্ষমা চেয়ে নেব।

কাফুর জড়িত কণ্ঠে বলিল, দূর থেকে কেন সম্রাট! কাছে বসেই দেখতে পাবেন।

সংশয়ের কণ্ঠে সম্রাট বলিলেন, সে কি আমার সামনে আসবে? আর আসলেই বা কি? হ্যাঁরে কাফুর। তুই-ই বলতো, আমার এ মুখ কি শাহেরকে দেখাতে পারি?

কাফুর সম্রাটের কাছে আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া বলিল, আসবেন। নিশ্চয়ই আপনার সামনে আসবেন। কেন আসবেন না? আপনি পিতা না?

তা বটে! তবু তুই স্মরণ করে দেখ তো! শাহেরের সাথে আমি যে দুর্ব্যবহার করেছি?

কাফুর বলিল, ওসব ভুলে যান সম্রাট।

সম্রাট একটু করুণ হাসিয়া বলিলেন, আমি কি আর সম্রাট আছিরে কাফুর? বারংবার সম্রাট সম্রাট করছিস কেন?

কাফুর বিনম্র কণ্ঠে বলিল, আপনি আমার কাছে চিরদিনই সম্রাট হয়েই বেঁচে থাকবেন।

তুই আমাকে খুব ভালবাসিস, নারে কাফুর! সম্রাট কাফুরের গায়ে পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

কান্না সামলাইবার জন্য কাফুর অন্যদিকে মুখ ঘুরাইয়া বলিল, এ বিদেশে বিভূঁইয়ে আমাকে ছাড়া আপনাকে আর কে দেখবে বলুন?

সম্রাট কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিলেন, সত্যি আমি তোদের প্রতি খুব অন্যায় আচরণ করেছিলাম। আল্লাহ তার প্রতিফলও দিয়েছেন। একটু চুপ থাকিয়া সম্রাট আবার বলিলেন, আমার আচরণের কথা ভুলে যা কাফুর।

আলোচনার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিবার জন্য কাফুর বলিল, আপনার ক্ষুধা পেয়েছে নিশ্চয়ই, সম্রাট। সম্রাটের ক্ষুধা এতক্ষণ আলোচনায় চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। কাফুরের কথায় আবার তাহা মোচড় দিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, তুই আমাকে খেতে দিবি কাফুর? তা, আজ চেয়েই খাই। যা নিয়ে আয়, কি আনবি।

কাফুর আর কিছু না বলিয়া বাহির হইয়া গেল এবং একটু পরেই কিছু খাদ্য ও পানীয় আনিয়া সম্রাটের সম্মুখে রাখিয়া বলিল, আপনি এগুলো খেতে থাকুন, আমি এখুনি এসে আপনাকে নিয়ে যাব।

সম্রাট ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, তুই চলে যাবি? কিন্তু কেউ যদি আমাকে মসজিদ থেকে বের করে দেয় কিংবা কিছু বলে কিংবা চিনে ফেলে? তবে কি মদীনার মানুষ আমাকে আর ক্ষমা করবে নাকি আস্ত রাখবে? জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে না?

সম্রাটের অহেতুক ভয় ও ছেলেমি দেখিয়া কাফুর না হাসিয়া পারিল না। সম্রাটের প্রতি তাহার করুণাও আসিল। প্রবল প্রতাপশালী সম্রাট তৃতীয়

ইয়াজদিগার্দ আজ প্রাণভয়ে ভীত। সে অভয় দিয়া বলিল, এখানে আপনাকে কেউ চিনবেও না, কিছু বলবেও না, মসজিদ থেকে বের করেও দেবে না। আপনি নিশ্চিন্তে আহার করুন, আমি আসছি।

এই বলিয়া কাফুর বাহির হইয়া গেল।

ঙ

নিহওয়ান্দের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সম্রাট ইয়াজদিগার্দ বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্বতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পরিবারবর্গের সঙ্গেও মিলিত হইতে পারিতেছেন না। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পাত্র-মিত্র, সভাসদ-পরিষদ, সৈন্য-সামন্ত, সবাই তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। সঙ্গে একজন গোলামও নাই, এক বেলার খাবারও নাই। তিনি আজ সর্বহারা। তাঁহার সর্বনাশ হইয়াছে।

একটি পাহাড়ের গুহায় শুইয়া শুইয়া তিনি ভাবিতেছেন, হাজার হাজার ব ৎসরের ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিশ্রুত কেসরা বংশের শেষ প্রতিভূ, লক্ষ লক্ষ ধনভাণ্ডারের মালিক, অগণিত মণি-মুক্তাখচিত হর্ম্যরাজির অধিকারী হতভাগ্য এই আমি তৃতীয় ইয়াজদিগার্দ আজ সর্বহারা, কপর্দকহীন একজন গুহাবাসী একটি খাদ্যদানাও জেবে নাই।

সম্রাট ভাবিতেছেন তাঁহার বিগত জীবনের কথা। ভাবিতেছেন মহানবীর পত্রপ্রেরণ, তাঁহার পিতা কর্তৃক তাহা শতছিন্ন, মহানবীর গ্রেফতারী পরওয়ানা, তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী, পিতাকে হত্যা, তাঁহার নিজরে কথা ও কাজ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, পরাজয়ের গ্লানি। ভাবিতেছেন শাহেরবানুর ইসলাম গ্রহণ, কারাবাস, নির্যাতন। মনে পড়িল গুলবানু ও পরীবানুর মৃত্যুদন্ড প্রদান, নাদিরার সলিল সমাধি, প্রাণাধিক পত্নী দিলরাজবানুর নিরুদ্দেশ।

সম্রাটের চোখ ছাপিয়া বুক ফাটিয়া কান্না আসিল। আসিল অনুতাপ, অনুশোচনা। হায়! হায়!! এমন কাজও মানুষ করিতে পারে! পিতা হইয়া কন্যাকে জল্লাদের হাতে তুলিয়া দেওয়া? কারাগারে নিক্ষেপ করা? সর্বনাশ তাঁহার হইবে না তো হইবে কাহার? সম্রাট অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

তাঁহার মনে পড়িল, কারাগার হইতে শাহেরবানু তাঁহাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিল, মদীনার খলীফার সাথে আপোষ করিলে প্রাণ ও রাজ্য দুই-ই রক্ষা পাইতে পারে। গুলবানু ও পরীবানুও তাঁহাকে ইসলাম গ্রহণ করিতে বলিয়াছিল। আর বলিয়াছিল কাদেসিয়ার ময়দানে যুদ্ধের পূর্বে একজন মুসলিম দূত। কাহারো কথা শুনি নাই। কিন্তু আজ? না পারিলাম রাজ্য রক্ষা করিতে, না মান-ইজ্জত বাঁচাইতে, না করিলাম ইসলাম গ্রহণ। নিজের হাতেই স্ত্রী-কন্যাদের ঠেলিয়া দিলাম মৃত্যুমুখে। শেষ পর্যন্ত মহানবীর কথাই ফলিল। আমার রাজ্যের শয়নকক্ষ এই পর্বতগুহাটাও এখন খলীফার

সাম্রাজ্যভুক্ত।

সম্রাট গুহা হইতে বাহির হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে লোকালয়ে উপস্থিত হইলেন। শুনিলেন, সবাই বলাবলি করিতেছে খলীফা ওমর, সেনাপতি সাদ ও নুমান বিন মোকাররানের কীর্তি গাথার কথা। কিন্তু কাহারো মুখে ইয়াজদিগার্দ কিংবা ফিরোজন এর নামটি পর্যন্ত উচ্চারিত হয় না।

এক বাজারে যাইয়া সম্রাট একটি সরাইখানায় একটি হীরার অঙ্গুরীর বিক্রি করিয়া ক্ষুণ্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করিতে চাহিলেন। সরাইখানার কেহ বলিল, বেটা গাট্টা চোর বটে! তা না হলে ফকিরের হাতে হীরার অঙ্গুরী? দাও! খলীফার দরবারে পৌঁছে দাও। বেটার হাতখানা কেটে দিলেই বাবাজী বুঝবে, খলীফার রাজ্যে বিচার কাকে বলে। কেহ বা বলিল, কয়েক ঘা জুতো লাগিয়ে দিলেই হয়? কেহ বা বলিল, কান ধরে বের করে দাও! সম্রাট দুঃখে ও লজ্জায় কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সরাইয়ের এক পার্শ্ব হইতে একটি লোক উঠিয়া আসিয়া সম্রাটকে টানিয়া বাহিরে লইয়া গেল এবং কানে কানে বলিল, আমি আপনাকে চিনেছি। কাছেই আমার কুটির। চলুন। এখানে আপনি নিরাপদ নহেন।

বাড়ীতে আনিয়া লোকটি সম্রাটকে কিছু আহার করিতে দিয়া বলিল, আমি আপনার একজন কর্মচারী ছিলাম। মাদায়েনের **পতনে**র পর পালিয়ে এসেছি।

এই লোকটির নিকট হইতেই সম্রাট জানিতে পারিলেন যে, মাদায়েনের কারাগারের বন্দীদের মুসলমানগণ মদীনায় লইয়া গিয়াছে এবং হালোয়ান হইতে তাঁহার পরিবারবর্গ ফরগানায় যাইয়া আশ্রয় লইয়াছেন।

এই লোকটির মাধ্যমে সম্রাট তাঁহার অঙ্গুরী, জামার বোতাম ও কোমরবন্ধ বিক্রি করিয়া আবার পথে নামিলেন। তাঁহার মনে হইল নাদিরা, দিলরাজ ও গুলবানু ও পরীবানু তো গেলই। কিন্তু শাহেরবানু জীবিত। অন্তত তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমা চাহিয়া মুক্তি নিতে পারিলে কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হয়। এই মনে করিয়া তিনি মদীনার পথ ধরিলেন।

এক জায়গায় তিনি কয়েকজন মুসলমানের সাক্ষাৎ পাইলেন। তাঁহারা মসুলে যাইতেছেন। এই কাফেলার সাথে সম্রাট মসুল আসিয়া এক মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে ইসলাম গ্রহণ করতঃ দ্বীন শিক্ষা করিতে প্রয়াসী হইলেন। ইমাম সাহেব ছিলেন একজন সাহাবী। তাঁহার কাছেই সম্রাট কোরআন ও হাদীসের মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিলেন। অবগত হইলেন মদীনার অনেক তথ্য।

এমনিভাবে পথ চলিতে চলিতে একদিন তিনি পৌঁছিলেন মদীনায়।

চ

সম্রাট আহার শেষ করিয়া ভাবিতেছেন, আল্লাহ মেহেরবান। কী শুভক্ষণেই না কাফুরের দেখা পাইলাম! তাহা না হইলে কি যে হইত।

এমন সময় কাফুর আসিয়া সম্রাটকে লইয়া পথ চলিতে লাগিল। সম্রাট ভাবিতেছেন, নিশ্চয়ই শাহেরবানু কাহারো বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করিতেছে, কাফুর সেখানেই তাঁহাকে লইয়া চলিয়াছে। কি করিয়া তিনি শাহেরবানুর মলিন মুখখানি দেখিবেন? আর বাড়ীওয়ালার কাছে পরিচয়ই বা দিবেন কেমন করিয়া?

সম্রাট বলিলেন, শোন কাফুর।

চলিতে চলিতেই কাফুর বলিল, বলুন সম্রাট!

সম্রাট বলিলেন, আমার আসল কথাটা বলছি শোন। আমি মনে করে এসেছিলাম যে, এখানে আমাকে তো কেউ চিনবে না। আমি কয়েক দিন ধরে মদীনার ও আশাপাশের সবগুলো বাড়ীর চারপাশে ঘুর ঘুর করে বেড়াব। নিশ্চয়ই একদিন দেখে ফেলব শাহেরবানু কোন্ বাড়ীতে কাজ করে। তখন সময় করে তার সঙ্গে দুটো কথা বলে চলে যাব। এখন তুই যখন আমাকে সেখানে ধরেই নিয়ে যাচ্ছিস তবে আমার পরিচয়টা বাড়ীওয়ালার কাছে বলবি নে। বলবি, অন্য কেউ। বুঝলি?

কাফুর দরদী গলায় বলিল, তিনি তো কারো বাড়ীতে কাজ করছেন না সম্রাট। তিনি সম্ভ্রান্ত পরিবারের অতি আদরের বধূ।

সম্রাট বিস্মিত কণ্ঠে বলিলেন, বলিস কিরে? কার বাড়ীতে?

কাফুর সশ্রদ্ধভাবে বলিল, ছাইয়েদুল মুরছালীন খাতেমুন নাবেয়ীন, রাহমাতুল লিল আলামিন, শাফিউল মুজনেবীন, নবীয়ে দুজাহান হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নয়নের নিধি, খাতুনে জান্নাত হযরত মা ফাতিমা (রাঃ)-র নয়ন পুত্তুলি, স্বর্গযুবরাজ, বেহেস্তের যুবকদের সরদার হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর পত্নী আমাদের মাদায়েন গৌরব শাহেরবানু।

সম্রাট দাঁড়াইয়া পড়িলেন, য়্যাঁ বলিস কিরে। আমার মেয়ে নবী পরিবারের বধূ। সত্যি! সম্রাটের মুখে উল্লাসের হাসি, চোখে আনন্দাশ্রু। বলিস কিরে! বলিস কিরে!! আল্লাহু আকবর! আল্লাহু আকবার!! ওয়া লিল্লাহিল হামদ!

সম্রাট কাফুরকে উল্লাসে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, বলিস কিরে, মহানবী আমার আত্মীয়, শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ) আমার বৈবাহিক! কি গৌরব! কি গৌরব!! হি! হি!! এত বড় খোশ খবরের জন্য তোকে কি এনাম দিই, বলতো কাফুর। আমার কি আর সে দিন আছে রে! বল! আমি কি এভাবে সে বাড়ীতে যেতে পারি? কি ময়লা কাপড়! নোংরা শরীর। তাছাড়া খালি হাতে জামাতার বাড়ী? না হয় বাজার হয়ে চল। কিন্তু......... ! তারা কি আমাকে মেনে নিতে পারবেন? তুই কি বলিস কাফুর! পারবেন?

সম্রাটের পাগলামি দর্শনে কাফুর না হাসিয়া পারিল না। বলিল, গেলেই বুঝতে পারবেন তাঁরা কেমন মানুষ! কত উদার ও মধুর তাঁদের ব্যবহার। চলুন।

হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর কক্ষে সম্রাটকে পৌঁছাইয়া দিয়া কাফুর কার্যান্তরে গমন করিল। একটি চৌকির উপর বসিয়া সম্রাট কত কি ভাবিতেছেন। এমন সময় সালাম করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন শাহেরবানু। একে অপরকে জড়াইয়া ধরিয়া সে কী কান্না! কত দিন পর পিতা-পুত্রীর সাক্ষাৎ। সম্রাট বলিতে লাগিলেন, তুই আমাকে ক্ষমা করে দে মা। আমি তোর কথা না রেখে আজ তার ফল ভোগ করছি। কত দিন তোকে দেখিনি, বলতো! কেমন লাগে? সম্রাট থুতনি ধরিয়া শাহেরবানুর মুখটি তুলিয়া ধরিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ডাকিলেন, শাহের?

এবার শাহেরবানু পিতার কাঁধে মুখ রাখিয়া অশ্রুসিক্ত করিতে লাগিলেন। সম্রাট শাহেরবানুর পিঠে হাত বুলাইয়া বলিতে লাগিলেন, তোর মত ভাগ্যবতী মেয়ে পৃথিবীতে আর কে আছে মা? মহানবীর পরিবারের সদস্যা তুই! মহানবী তোর নানাজী, হযরত ফাতেমা (রাঃ) তোর মা, শেরে খোদা তোর শ্বশুর, বেহেস্তের যুবরাজ তোর স্বামী। তোর সাথে সাথে আমিও ভাগ্যবান হয়েছি তোর পিতা হয়ে। এটাই যে আমার সবচে বড় গৌরব। আমি মহাপাতকী। তবু আশীর্বাদ করি তুই সুখী হ মা।

আব্বা যে শাহেরবানুকেই সব আশীর্বাদ করে ফেলেছেন। আমাদেরকে বাদ দিলেন যে! আমরা কি আপনার মেয়ে নই? এই কথা বলিতে বলিতে একযোগে কক্ষে প্রবেশ করিলেন গুলবানু ও পরীবানু।

কি যেন বলিতে যাইয়া সম্রাট যেন মখ খুলিয়াছিলেন, সেই মুখের হা আর বন্ধ হইল না। চোখ ছানা বড় হইয়া উঠিল। আর পলক পড়িল না। ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলানো লোকের মত ফ্যাকাসে এবং পাথরের মূর্তির মত নিষ্প্রাণ নির্বাক হইয়া সম্রাট দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পিতার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া গুলবানু বলিলেন, আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে জল্লাদের হাত থেকে আমরা বেঁচে গেছি আব্বা। সে আমাদের হত্যা করতে পারেনি।

গুলবানু ও পরীবানুকে জড়াইয়া ধরিয়া সম্রাট হো! হো!! করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বলিলেন, আমার মহাপাপের মহাপ্রায়শ্চিত্তই হয়েছে। আজ তোদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবার অধিকারও আমার নেই। শুধু তোদের কাছে আমার আবেদন, আল্লাহর দরবারে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিস্ মা।

ভগ্নিত্রয়ও বলিলেন, আমাদের জন্যও দোয়া করবেন আব্বা।

সম্রাট এক মেয়েকে ডাইনে, এক মেয়েকে বামে এবং এক মেয়েকে কোলে বসাইয়া কাঁদিতেছেন, হাসিতেছেন আর বলিতেছেন, কে বলে মা আমার সর্বনাশ হয়েছে? কে বলে আমি সর্বহারা? আমি আজ সর্বজয়ী। বলতো মায়েরা আমার মত বিরাট আর কে আছে?

শাহজাদীগণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আপনি যে আমাদের পেদর! আপনি ইহকালেও বিরাট, পরকালেও বিরাট।

সম্রাট মাথার শতছিন্ন পাগড়ীর ভাঁজ খুলিয়া কতগুলি মণি-মক্তা, হীরা-জহরত বাহির করিয়া মেয়েদের হাতে দিয়া বলিলেন, এই নে মা, আমার শেষ সম্বল। তোরা ভাগ করে নে। আমার যে আর কিছু নেই। সম্রাট খল খল করিয়া হাসিতে লাগিলেন। যেন শিশু!

মেয়েরা পিতার খাবার যোগাড়ে গেলেন। সম্রাট ভাবিতেছেন, সত্যিই তো। রাখেন আল্লাহ, মারে কে? আমি পাপিষ্ঠ মারিতে চাহিলাম, কিন্তু আল্লাহ মেহেরবান গুল পরীকে বাঁচাইলেন। হঠাৎ একটি ছায়া দেখিয়া সম্রাটের চিন্তা সূত্র ছিন্ন হইল। দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নাদিরা। সম্রাট চমকিয়া উঠিলেন। একি! নাদিরা এখানে? নাগিরা মুচকি হাসিতে লাগিলেন। সম্রাট উঠিয়া গিয়া নাদিরাকে ধরিতে যাইবেন, অমনি হাসিতে হাসিতে আসিয়া হাজির হইলেন দিলরাজবানু। সম্রাট বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আমি কি জ্যান্ত যাদুঘরে এসে পড়েছি? সবাই যেন মাটি ভেদ করে উঠে আসছো! সবই কি ভোজবাজী? সম্রাট সম্রাজ্ঞীদ্বয়ের হাত ধরিলেন।

নাদিরা বলিলেন, ভোজবাজী নয়, তবে সেই মহান আল্লাহর লীলাখেলা মাত্র। সম্রাট শুনিলেন তাঁহাদের কাহিনী।

দিলরাজবানু বলিলেন, আপনি এখন জামাতা বাবাজীদের সাথে পরিচয় করুন, আমরা আছি এখানেই। সম্রাজ্ঞীদ্বয় বাহির হইয়া গেলেন।

কাফুরের সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করিলেন জামাতাত্রয়। কাফুর একে একে সবাইকে পরিচয় করাইয়া দিল। তিন শাহজাদা সম্রাটকে সালাম করিলেন। শাহজাদাদের পরিচয় পাইয়া সম্রাট তাঁহাদের আলিঙ্গন করিয়া আনন্দ গদ গদ কণ্ঠে আবার বলিতে লাগিলেন, মহান আল্লাহর লাখো শুকরিয়া, আমার মত সৌভাগ্যশালী ধরাতলে আর কে আছে বাবাজীরা বলতো! মরহুম খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ), বিশ্ববিশ্রুত প্রবল প্রতাপান্বিত মহান খলীফা হযরত ওমর (রাঃ), শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ) আমার বৈবাহিক। কে বলে আমি রাজ্যহারা? আমি আজ বিশ্ব সম্রাট! আমার মাদায়েন গেছে বটে! কিন্তু মদীনা পেয়েছি। পেয়েছি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বদের আত্মীয়তা; হয়েছি অপাংক্তেয় থেকে পাংক্তেয়। আমি সর্বজয়ী। আমি স্বর্গজয়ী।

ছ

প্রায় এক সপ্তাহকাল মদীনায় কাটাইয়া সম্রাট-সম্রাজ্ঞীদ্বয়সহ পরিবারের অন্যদের সাথে মিলিত হইবার জন্য ফারগানায় চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি শান্তিতেই জীবন যাপন করিতেছিলেন।

হযরত উছমান (রাঃ)-র খেলাফতের সময় ৬৫১ খৃষ্টাব্দে এক আততায়ী কর্তৃক সম্রাট তৃতীয় ইয়াজদিগার্দ নিহত হন।

সমাপ্ত